হিরণ্যগর্ভ
দশম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
১লা বৈশাখ, ১৪২৪

Hiranyagarbha
Volume 10, No. 1
हिरण्यगर्भ
दशम वर्ष, प्रथम संख्या
तारिख-१५अप्रैल,२०१७

১লা বৈশাখ, ১৪২৪ 15th April, 2017

সূচীপত্র a Contents

বাংলা বিভাগ ঃ—

রুদ্রাবতার গোরক্ষনাথ	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	05
যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা	শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	08
জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	09
গুরুগীতা	যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	11
শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী	বৃহৎ কিশোরী ভাগবত - সংগৃহীত	12
দেবরাজ শতক্রতু	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	13
শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	14
রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধা শ্রীশ্রীসতীমায়ের লীলামৃত	শ্রীমতী বীণা চৌধুরী	15
নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা	শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর	17
শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম বদ্রীনাথধাম ভ্রমণ কথা	স্বামী সংবেদানন্দজী	18
যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	19
যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব	অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায়	20
গীতা ভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	21
নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	22
জীবনাভাস	শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়	24

হিন্দী বিভাগ ঃ—

रुद्रावतार गोरक्ष नाथ	श्रीविमलानन्द	27
श्रीकृष्ण की तपस्या	श्रीमती ज्योति पारेख	30
योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा	श्रीचंद्र पारेख	31
उन्मेष	श्रीमती सुशीला सेठिया	32
श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली	श्रीविमलानन्द	33
ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर	श्रीविमलानन्द	35
श्रीश्रीमाँ की प्रथम बद्रीनाथधाम यात्रा	श्रीमती ज्योति पारेख	37
गुरुगीता	श्रीश्रीमाँ सर्वाणी	38
देवराज शतक्रतु	श्रीमती ज्योति पारेख	39
नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला	श्रीमती सुशीला सेठिया	40
योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक	श्रीविमलानन्द	41

English Section ঃ—

Rudravatar Sri Gorakshnath	Prof. Partha Pratim Chakrabarti	43
Biography of Manicklal Dutta	Dr. Barun Dutta	47
Gems From the Garland of Letters	Sri Arnab Sarkar	49
The Philosophy of Truth	Dr. Barun Dutta	51
My Life With Anirvan	Sri Gautam Dharmapal	52
Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo	Dr. Barun Dutta	53

ISBN No. 978-93-80373-93-5 Cover : Mahayogishwar Sri Gorakshanath

Printed and Published by Dr. Barun Dutta on behalf of Mata Sharbani Trust, Plaza Housing, Vill : Jagannathpur (Shibrampur), P.O. : Ashuti, Pin : 700141, 24 Parganas (South), West Bengal, India. Tel : (033) 2488-1826, website : www.akhanda-mahapeeth.org, Email : akhanda.mahapeeth@gmail.com. Printed at : Rama Art Press, 6/30, Dum Dum Road, Kolkata-700 030, Tel : 2557-4419

Editor : Shri Arnab Sarkar • Associate Editors : Smt. Keya Chakraborty and Shri Mohit Shukla

সম্পাদকীয় / Editorial

চৈত্রশেষের ঝরাপাতা বয়ে নিয়ে আসা উদাসী বাতাসের উপান্তে ভেসে আসে নববর্ষের মাঙ্গলিক পদধ্বনি। নতুন বছরের নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও শুভবুদ্ধি আমাদের অন্তরলোককে উদ্বুদ্ধ করুক — নবীনের আশ্বাসে আমরা যেন ভুলে যাই পুরাতনের সকল গ্লানি। বছরের অন্তিমলগ্নে আমরা মেতেছিলাম দোল উৎসবের আবির-রাঙা আনন্দে — আজ আমাদের প্রতীক্ষা গ্রীষ্মের উষ্ণ রুদ্ররূপের।

রুদ্রের এই আপাতঃ কঠোর রূপের মাঝে লুকিয়ে থাকে এক পরম মঙ্গলময় রূপ — তা' যেন এক মহাযোগীর তপঃক্লিষ্টতা। তাই বাংলা নববর্ষের এই বিশেষ সংখ্যাটি আমরা নিবেদন করলাম রুদ্রাবতার মহাযোগী শ্রীগোরক্ষনাথের চরণকমলে।

প্রাচীন ভারতে সর্বাধিক ঐশ্বর্য্যশালী ও উন্নত সাধনমার্গের অধিকারী ছিলেন শৈবযোগ - ধর্মাবলম্বী "নাথ" সম্প্রদায়। তাঁরা ছিলেন যোগৈশ্বর্য্য-সিদ্ধ, সদাচারনিষ্ঠ ও কৈবল্য-মার্গ প্রদর্শক। সত্যনিষ্ঠ আচরণে ও আশ্চর্য্য সাধনবলে তাঁরা অর্জন করেছিলেন সাধন-অভিমুখ মানবের আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা। অযোনিসম্ভবা, একাদশ রুদ্রের অংশভূত, শিবকল্প যোগী গোরক্ষনাথই "নাথ" সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

আজ শুভ নববর্ষের (১৪২৪ বঙ্গাব্দে) পুণ্যলগ্নে হিরণ্যগর্ভের এই নববার্ষিক সংখ্যাটি সেই অমর মহাত্মার শ্রীচরণে অর্পণ করে ও গুরু-পরম্পরার শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে আমরা ধন্য হলাম।

One can perceive the ringing tunes of New Year in the trail of the gusty winds of late spring. This is an occasion to revitalize ourselves – to take a fresh oath to raise ourselves above all pettiness and fill our hearts with unblemished bliss and noble thoughts. Let the new times wash out all the imperfections of the past years!

A few days ago, we had immersed ourselves in the glee of colourful Holi, but now the surroundings have started to turn grey with the gradual advent of summer. Nevertheless, a latent blessing always remains veiled under the austere façade of the summer ("rudra"). It resembles the austere path of penance embraced by a yogi. That is why we have decided to dedicate this summer issue of Hiranyagarbha on the lotus feet of Rudravatar Mahayogi Shri Gorakhnath.

In ancient India, the Shivaite cult of the "Nath" yogis were one of the most enlightened religious sects, devoted towards the path of absolute wisdom and supreme knowledge. They were blessed with immense yogic power and chastity and traded the path of salvation. By virtue of their righteousness and spiritual power, they used to command the highest esteem and respect of ascetics and the pious. Saint Gorakhnath – the Shivakalpa yogi and one of the embodiments of the eleven "Rudras" – was the haloed founder of this cult.

On the auspicious occasion of the Bengali New year (1424 Bangabda), we bow our heads in humble homage to His lotus feet and pray to all Gurumaharajas and esteemed Mahatmas to bless us on our spiritual journey.

রুদ্রাবতার গোরক্ষনাথ

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

এক সময় সমগ্র বিশ্বে সর্বাধিক ঐশ্বর্য্যশালী এবং উন্নত ধর্ম ও সাধনমার্গের অধিকারী ছিল 'নাথ' যোগী সম্প্রদায়। সঠিকভাবে অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল ধর্মই শৈব-যোগধর্ম হইতে কিছু না কিছু সাধন প্রণালী গ্রহণ করিয়াছে। তদানীন্তন শৈবযোগ-ধর্মাবলম্বীগণকে 'নাথ' বলিয়া অভিহিত করা হইত। 'নাথ' অর্থে প্রভু। নাথ গুরুগণ ছিলেন সকলের প্রণম্য। নাথ সিদ্ধগণ জাতিভেদের সংকীর্ণ গোঁড়ামি স্বীকার করিতেন না। তাঁহারা ছিলেন প্রকৃত সদাচারনিষ্ঠ, সাম্যবাদের মূর্ত প্রতীক। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই তাঁহারা আপন করিয়া লইতেন এবং প্রদান করিতেন তাঁহাদের অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা তাই সকল শ্রেণীর মানুষই তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিত এবং ভক্তিও করিত। প্রাচীন যুগেই নাথ যোগীদের প্রাধান্য সর্বাধিক ছিল, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। নাথেরা ছিলেন 'রুদ্রজ ব্রাহ্মণ'।

যোগীশ্বর শ্রীগোরক্ষনাথ

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ৮ম ও ৯ম অধ্যায়ে আছে ব্রহ্মার ললাট হইতে রুদ্রজ ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মার ললাট হইতে 'মহান' আদি একাদশ রুদ্রের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। এই একাদশ রুদ্র হইলেন রুদ্রজ ব্রাহ্মণদের আদি পুরুষ। এঁনারা সকলেই ছিলেন যোগ-সাধক মহাযোগী। রুদ্রজ ব্রাহ্মণগণ হইলেন নিবৃত্তিমার্গের জ্ঞানকাণ্ডী ব্রাহ্মণ। তাঁহারা ছিলেন মানব-কল্যাণে ব্রতী। যোগ সাধনার মাধ্যমে তাঁহারা অসংখ্য বিভূতি লব্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এমন সব শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন যে সেগুলিকে বলা যায় অলৌকিক। যোগসাধন তপস্যার বলে তাঁহারা ইন্দ্রিয়াদি জয় করিয়া নিজেই নিজের দেহ ও মনের অধীশ্বর হইলেন এবং প্রাপ্ত হইলেন অমরত্বের সন্ধান, পাইলেন কৈবল্য-মুক্তির উপায়। শৈবযোগধর্ম প্রচার করেন নাথ যোগীগণ। তাঁহাদের প্রধান আরাধ্য হইলেন পরমব্রহ্ম যোগীশ্বর শিব। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যোগসাধনার মাধ্যমে শিবস্বরূপত্বকে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাত হইয়া শিবত্বলাভ করিয়াছিলেন। যোগ প্রভাবে আদিনাথ শিব, তৎশিষ্য মৎসেন্দ্রনাথ বা মীননাথ, তৎশিষ্য গোরক্ষনাথ প্রমুখ যোগীশ্বরগণ জীবিতকালেই শিবাবতার রূপে জগতে পূজিত হইয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে অদ্বৈত ব্রহ্ম পরমজ্যোতি ভগবান শিব শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছেন — ''কেবলমাত্র সূক্ষ্মদ্রষ্টা যোগীগণই আমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে।'' — (শ্রীশ্রীশিবগীতা)। দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগ ও যোগীদের সবার উপরে স্থান দিয়াছেন।

নাথযোগী 'গোরক্ষনাথ'। 'গো' অর্থে বিশ্ব এবং 'রক্ষ'-অর্থে রক্ষা করা অথবা রক্ষণাবেক্ষণ করা। অতএব বিশ্বকে রক্ষা করেন যিনি বা বিশ্বকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন যিনি তিনিই গোরক্ষনাথ । তপস্বী, সংযমী, ব্রতপরায়ণ, অণিমাদি অষ্টবিধ যোগৈশ্বর্য্যে সিদ্ধ রুদ্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণগণকে 'নাথ' বলা হয়। 'নাথ' অর্থে ত্রিভুবনের পালনকর্তা পরমেশ্বর শিবকেই বোঝায়। শৈবদর্শন মতে ভগবান শিবই জগতের আদি কারণ। তাই শিবের নাম সবই 'নাথ' শব্দ সম্বলিত। যেমন — বিশ্বনাথ, কাশীনাথ, অমরনাথ, কেদারনাথ, সোমনাথ ইত্যাদি। যোগীগণ পরমেশ্বর শিবের উপাসক বলিয়া তাঁহারা শৈব; তাঁহারা নিজেদের শিব-সন্তান বলিয়া মনে করেন। তাই তাঁহারাও 'নাথ' উপাধিতে ভূষিত হইলেন। মীননাথ ভগবান শিবের শিষ্য-সন্তান ছিলেন আর তাঁহার সন্তান-শিষ্য হইলেন গোরক্ষনাথ। যোগীরাজ মৎসেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের কার্য্যকলাপাদি ভারত ছাড়াও নেপাল, চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া আছে এবং ইঁহারা শিবাবতার রূপে সর্বত্র পূজিত হন।

'নবনাথ ভক্তিসার' নামক গ্রন্থে গোরক্ষনাথের জন্ম সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত কাহিনী আছে। — গোরক্ষনাথের গুরু মৎসেন্দ্রনাথজী তীর্থ পর্যটন কালে একদা বাংলা প্রান্তের ধারা নগরীতে 'সরস্বতী' নামক এক রমণীর নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই রমণীর কোন সন্তানাদি ছিল না। ভিক্ষাদান কালে সেই রমণী তাঁহাকে একজন মহাতেজস্বী সিদ্ধসন্ত বুঝিতে পারিয়া ভিক্ষাদানান্তে তাঁহার নিকট পুত্রবর প্রার্থনা করেন। মৎসেন্দ্রনাথজী কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে কিছু বিভূতি প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে সেই বিভূতি সেবন করিলে যথা সময়ে তাহার পুত্ররত্ন লাভ হইবে।

মহাত্মা বিদায় হইলে পর অন্যান্য রমণীগণ তখন এই সম্বন্ধে তাহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে থাকে। ইহাতে সরস্বতীর সাধুর দেওয়া বস্তুর প্রতি আস্থা চলিয়া যায়। তখন উত্যক্ত হইয়া রমণী ঐ বিভূতি-প্রসাদ ভক্ষণ না করিয়া গোরক্ষাতে (গোবরের আবর্জনাদি ফেলিবার স্থানে) নিক্ষেপ করেন। ১২ বৎসর পর মৎসেন্দ্রনাথজী পুনরায় আগমনপূর্বক ঐ রমণীর নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। রমণী ভিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন —''তোমার পুত্র কোথায়?'' বিভূতি সেবন করা হয় নাই, একথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন —''আমার সেই সিদ্ধ বিভূতি নিশ্চয়ই পুত্ররত্ন প্রসব করিয়াছে; যেখানে সেই বিভূতি রক্ষা করিয়াছিলে, সেখানে চল।'' সেখানে উপস্থিত হইয়া মৎসেন্দ্রনাথজী পুত্রকে আহ্বান করিলেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তখন দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালক গোরক্ষা হইতে উঠিয়া আসিয়া মৎসেন্দ্রনাথজীর নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। ঐ গোরক্ষা হইতেই তাঁহার নাম 'গোরক্ষনাথ' হয়। তিনি তখন মৎসেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। এই কিংবদন্তী হইতে প্রজ্ঞাবুদ্ধিতে বুঝিতে পারা যায় যে গোরক্ষনাথ তাঁহার পূর্বাবস্থায় কায়াকল্প যোগসিদ্ধ অবস্থা হইতে অযোনিসম্ভবা সত্তারূপে গুরু মৎসেন্দ্রনাথের আবাহনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

প্রজ্ঞালোকে জানা যায় যে মৎসেন্দ্রনাথাদি শিবকল্প মহাযোগীশ্বরগণ একাদশ রুদ্রের অবতার। (একাদশ রুদ্রের কথা :— সনকাদি পুত্রগণকে সৃষ্টিকার্য্যে নিরপেক্ষ দেখিয়া ব্রহ্মা অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তখন বিষ্ণু তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ব্রহ্মা পূর্বে শিবকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন ব্রহ্মা দুঃসাধ্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াও কোন ফল না পাওয়ায় তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল এবং তখন তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুবিন্দু সকল ভূতলে পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রুবিন্দুগুলি হইতে তখন বহু সংখ্যক ভূত-প্রেত উৎপন্ন হইলে তদ্দর্শনে ব্রহ্মা ক্রোধে-দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন ব্রহ্মার শরীর হইতে করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে একাদশ জন 'রুদ্র' আবির্ভূত হয়। তাঁহারা রোদন করিতে করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের নাম হয় 'রুদ্র'। একাদশ রুদ্রের আবির্ভাবের পর মহাদেব ব্রহ্মার সংজ্ঞাদান করিলে পরে ব্রহ্মার ললাট হইতে ঐ একাদশ রুদ্রের প্রভু স্বরূপ 'আদি রুদ্র'দেবও প্রাদুর্ভূত হইলেন। এই আদি 'রুদ্র'দেব হইলেন স্বয়ং শিব (মহাদেব)। এই রুদ্র প্রথমে ব্রহ্মার পুনর্জীবন দান করিয়া পরে তাঁহারই পুত্রস্বরূপ হয়েন। ব্রহ্মা সংজ্ঞালাভ করিয়া 'প্রভুরুদ্র'কে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। প্রভুরুদ্র তখন ব্রহ্মাকে স্মরণ করাইয়া দেন যে ব্রহ্মার পূর্ব প্রার্থনা অনুসারেই তিনি তাঁহার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।-(বায়ু ও কূর্মপুরাণ)। আবার, শিবপুরাণে আছে মহাদেবের অঙ্ক হইতেই 'রুদ্র' নামে এক দেব উৎপন্ন হন। মহাদেবের অংশোদ্ভব হওয়ায় তিনি সামর্থ্যে মহাদেব হইতে কোনও ক্রমে ন্যূন নহেন। 'রুদ্র' প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন নহেন। মহাদেব ব্রহ্মার ললাট হইতে রুদ্রকে সৃজন করেন। ঐ রুদ্র তমোগুণ প্রধান অর্থাৎ ব্রহ্মযোগগম্যা। —বৈদিক মতে, রুদ্র প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের অন্যতম দেবতা। ঋষিরা রুদ্র সম্বন্ধে অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। বহু স্থলে ঋষিরা অগ্নিকেই 'রুদ্র' নামে অভিহিত করিয়াছেন; আবার কোনও কোনও স্থলে ব্রহ্মাকেই রুদ্র বলা হইয়াছে।—ঋক্ ১/৩৯/৪; ১)

মৎসেন্দ্রনাথ, তৎশিষ্য গোরক্ষনাথ এবং তৎশিষ্য নব নাথেরা সমষ্টিগতভাবে একাদশ রুদ্রের অংশসম্ভূত শিবগণ। ইঁহারা ভগবান শিব হইতে 'পরমযোগ' প্রাপ্ত হইয়া কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া জগতের কল্যাণকর্মে নিজেদের নিযুক্ত করেন। গোরক্ষনাথের জন্ম সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে 'গোরক্ষ পুরাণে'র এই কাহিনীটি সর্বাপেক্ষা প্রচলিত। তবে নাথধর্ম অনুসারে গোরক্ষনাথ হইলেন অযোনিসম্ভবা। পরব্রহ্ম নিরঞ্জনের দেহ হইতে তাঁহার উদ্ভব হইয়াছে। গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে আছে যে মহাদেবের জটা হইতে গোরক্ষনাথের জন্ম। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে অলখনিরঞ্জন-স্বরূপ শিবব্রহ্মের সঙ্গে গোরক্ষনাথের অঙ্গাঙ্গিভাবে যোগসূত্র রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গ হইতেই বোধগম্য হয় যে গোরক্ষনাথ 'শিবাবতার' ছিলেন। গোরক্ষপুরে বা গোরখপুরে গোরক্ষনাথের তপোলব্ধ আসন প্রতিষ্ঠিত আছে। কথিত আছে যে ত্রেতাযুগ হইতে এই আসন প্রতিষ্ঠিত। একথা বাবা গম্ভীরনাথজী বলিয়াছিলেন। গোরখপুরে গোরক্ষনাথের মন্দিরও ত্রেতা যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় বাবা গম্ভীরনাথজী বলেন যে, ''না, কিন্তু আসন ঠিকই আছে।'' সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজীর সময় একবার এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় আরও একবার এই স্থানের মন্দির ধ্বংস করা হইয়াছিল; কিন্তু তখনও আসনটি রক্ষা করা হয়। নাথ সম্প্রদায়ের সাধুগণ গোরক্ষপুরেই গোরক্ষনাথের আদি সাধনক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ করেন এবং সেই আসন তাঁহার তপস্যার সময় হইতেই তথায়

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। গোরক্ষনাথের তপোস্থলী তাঁহারই নামানুসারে পরবর্তীকালে 'গোরখপুর' বলিয়া পরিচিত হয়। অন্য প্রবাদ অনুসারে গোরক্ষনাথের প্রথম তপস্যাস্থল বদরিকাশ্রম। গুরু মৎসেন্দ্রনাথ নবীন সন্ন্যাসী গোরক্ষনাথকে লইয়া বদরিকাশ্রমে গমনপূর্বক তথায় তাঁহাকে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী শৈবযোগে কঠোর তপস্যায় রত করেন। সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি ধর্মপ্রচারার্থ নেপাল প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হন। ইহার পর, সম্ভবতঃ তপস্যায় সিদ্ধিলাভান্তে গোরক্ষনাথ গোরখপুরে আসিয়া তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

সকল প্রবাদ হইতে জানা যায় যে সত্য যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক পর্য্যন্ত মহাযোগী গোরক্ষনাথের অস্তিত্বের নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব সত্য, ত্রেতা দ্বাপর, কলি — এই চারি যুগেই গোরক্ষনাথের প্রকট-প্রমাণ রহিয়াছে। গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণের মধ্যে একটি বিশ্বাস-প্রবাদ আছে যে গোরক্ষনাথ অমর মহাত্মা এবং সূক্ষ্মশরীরে তিনি এখনও বর্তমান আছেন; লোক হিতার্থে তিনি নানা স্থানে বিচরণ করেন এবং কোন কোন ভাগ্যবান পুরুষ তাঁহার দর্শনও লাভ করেন। আমাদের শ্রীশ্রীসরোজবাবা যখন হিমালয়ের দুর্গম স্থান পরিব্রাজনা করিতেছিলেন, সে সময় একবার মানস সরোবর যাইবার পথে একটি গুহায় এক অতি প্রাচীন ঋষি-মহাত্মাকে দর্শন করিয়াছিলেন। সেই মহাযোগীপুরুষ অতি শীর্ণকায়, তাঁহার মস্তক হইতে জটার লহর মাটি পর্যন্ত নামিয়াছে, এমন কি তাঁহার চক্ষুদ্বয়ের পাতা হইতেও সরু সরু জটা নামিয়া কপোলকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মহাযোগীর নয়নদ্বয় নিমীলিত এবং তাঁহার সম্মুখে ধূনী প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে। সরোজবাবা তাঁহার সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হইলে পরে তিনি তাঁহার হস্তদ্বয় দ্বারা চক্ষুদ্বয়ের জটাভার সরাইয়া চক্ষু উন্মীলিত করিলে দেখা গেল তাঁহার নয়ন হইতে জ্যোতির ছটা নির্গত হইতেছে এবং তিনি বলিলেন —''সপ্তম পুরুষ''। — পরবর্তীতে সরোজবাবা জানিতে পারিয়াছিলেন যে ইনি কায়াকল্পসিদ্ধ অতি প্রাচীন মহাযোগী গোরক্ষনাথ স্বয়ং এবং সরোজবাবা হইলেন তাঁহার বংশের সপ্তম পুরুষ, যিনি সাধু হইয়াছেন। হঠ্যোগসিদ্ধ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের যোগশক্তিবলে যুগযুগান্তব্যাপী জীবিত থাকিতে পারেন।

মহাযোগী গোরক্ষনাথের জন্মগ্রহণ বিষয়ে যেমন নানা মত প্রচলিত, তেমনি তাঁহার তিরোধান ও সমাধিস্থল সম্পর্কেও মতভেদ রহিয়াছে। গোরক্ষনাথের তিরোধান ও সমাধিস্থান দুই-ই অপরিজ্ঞাত।

কানফাটা যোগী সম্প্রদায় দাবী করে যে গোরক্ষনাথই এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। যোগাচার্য্য গোরক্ষনাথের ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। তিনি সমগ্র বিশ্বে ভ্রমণকরতঃ শৈবনাথধর্মের অমৃতবাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন অসংখ্য শাস্ত্র, যা সাহিত্য জগতের এক অনবদ্য সম্পদ। তিনিই সর্বপ্রথম হিন্দীভাষায় কাব্যরচনা করেন; তাই তিনি হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের জনক। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে যোগবীজ, গোরক্ষ পদ্ধতি, সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতি, গোরক্ষবোধ, জ্ঞানসিদ্ধান্ত যোগ, গোরক্ষ যোগতন্ত্র, হঠ্যোগ, গোরক্ষগীতা, গোরক্ষসংহিতা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

—ওম্ নমঃ রুদ্রায়—

১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১৭, শ্রীগৌতম ধর্মপালের ইহজীবনের অবসান ঘটে। শ্রীমৎ অনির্বাণের অন্তরঙ্গ ভক্তদের অন্যতম এই সহজ সরল সদাহাস্যময় মানুষটি যেমন ছিলেন ভারতীয় সনাতন আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের এক বিশিষ্ট পণ্ডিত,

তেমনই ছিলেন সুগভীর ধ্যানসিদ্ধ এক মনীষী। শ্রীঅনির্বাণজীর সংস্পর্শে অতিবাহিত তাঁর বর্ণময় জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও ঘটনাবলী শ্রীধর্মপালজী ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর ''মাই লাইফ উইথ্ অনির্বাণ'' নামক প্রবন্ধটিতে যা হিরণ্যগর্ভ পত্রিকায় গত কয়েকবছর যাবৎ ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীঅনির্বাণজীর উপনিষদ্ প্রসঙ্গের অন্তর্গত বেশ কয়েকটি উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ। শ্রীশ্রীমায়ের সাথে পরিচয় হবার পর থেকেই শ্রীগৌতম ধর্মপালের ও তাঁর স্বর্গীয়া স্ত্রী শ্রীমতী গৌরী ধর্মপালের শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে এক শ্রদ্ধাপূর্ণ মধুর হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমরা শ্রীশ্রীমায়ের সন্তানগণ শ্রীগৌতম ধর্মপালের প্রতি জানাই আমাদের শ্রদ্ধা বিনম্র প্রণাম।

যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

প্রসঙ্গ (৩৪)

একদিন অংশুমানের (শ্রীশ্রীবাবার অন্যতম সন্তান অংশুমান ব্যানার্জী) খুব ইচ্ছা হল দাদাকে বাড়ী থেকে মাছের ঝোল করে এনে নিজের হাতে খাওয়াবেন। কিন্তু অংশুমান সে সময় সাধারণতঃ দাদার বাড়ীতেই থাকতেন এবং সেখানেই খাওয়া-দাওয়া করতেন। সেই কারণে রামরাজাতলা বাজার থেকে মাছ কাটিয়ে এনে বৌদিকে (দাদার স্ত্রী) দিয়ে রান্না করালেন। তারপর দাদা যখন খেতে বসেছেন তখন সেখানে গিয়ে দাদাকে মাছ খেতে দিলেন। (এই সময় আশীষদা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।) কিন্তু দাদা সেই মাছ খেতে চাইলেন না। বললেন, ''এখন খেতে ইচ্ছা করছে না।'' তবুও অংশুমান অনেক বলা-কওয়ার পর দাদা একপ্রকার গররাজী হয়েই মাছটা খেলেন। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে থালাতে যে অবশিষ্ট মাছের ঝোল পড়ে ছিল, আশীষদা সেটা একটু চেখে খেতেই এত তিক্ত স্বাদ পেলেন যে আর মুখে তুলতেই পারলেন না। এতে আশীষদা অবাক হয়ে গেলেন যে এত তেতো স্বাদের মাছ দাদা গলদ্ধকরণ করলেন কেমন করে! — আসলে হয়েছিল কি যে মাছটার পিত্তটা গলে গিয়ে মাছময় হয়ে গিয়েছিল; সমস্ত মাছটাই ভীষণ কটু ও তিক্ত স্বাদ হয়ে গিয়েছিল। তখন আশীষদা দাদাকে বললেন, ''দাদা, এই এত তিক্ত মাছটা খেয়ে ফেললেন কি করে?'' দাদা বললেন, ''অংশুমান এত ভালবেসে খেতে বলল, আমি কি না খেয়ে পারি?'' — এই আমাদের সর্বংসহা দাদা।

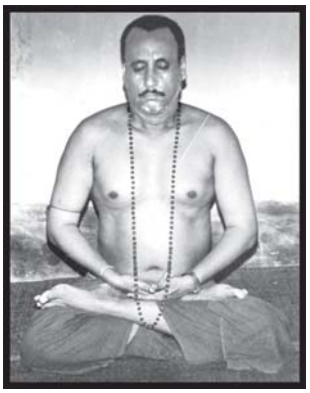

মহাত্মনেরা ভক্তের আন্তরিক ভক্তি দেখেন, তাঁরা বাইরের বিষয় অত লক্ষ্য করেন না। ভক্তের ভালবাসার দান তাঁরা নির্বিকার হয়েই গ্রহণ করেন। অন্যপক্ষে এটিও শিক্ষণীয় যে মহাত্মাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যওয়াটায় সুফল হয় না। সদ্‌গুরুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনোই নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে নেই। সর্বদা সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করে কর্ম করা উচিত নইলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বিড়ম্বনায় পড়তে হয়।

প্রসঙ্গ (৩৫)

ঘটনাটি আশীষদার সামনেই ঘটেছিল, তাই আশীষদার মুখনিঃশ্রিত ভাষাতেই ঘটনাটি প্রকাশ করি।

—''কোন একজন বয়স্ক ভক্তলোক দাদার কাছে বসে থাকতেন; সেই ভদ্রলোকের নাকের ভিতর (ওজিনা) থেকে ভীষণ দুর্গন্ধ ছাড়তো। সেই দুর্গন্ধ আশে-পাশে মাঝে মাঝে ছড়িয়ে পড়ত। একদিন সেই ভদ্রলোককে আমি বললাম, ''কি ব্যাপার বলুন তো? আপনার নাক থেকে এ-ধরণের গন্ধ আসছে কেন?'' উনি বললেন, '' বহু ডাক্তার দেখিয়েছি কিন্তু সারছে না।'' ভদ্রলোক দাদার কাছ থেকে একটু দূরেই বসেন। এরপর দু-একদিন বাদে দেখি যে দাদার কাছে বসে আছি এবং দাদার নাক থেকে ঠিক ঐ ভদ্রলোকের মতন দুর্গন্ধ ছাড়ছে। দাদাকে বললাম, ''এটা কি হল, দাদা এ রোগটা কোথা থেকে এল? এটা তো আপনার ছিল না।'' দাদা কোন উত্তরই দিলেন না। তারপর দু-একদিন বাদে দাদার নাক ঠিক হয়ে গেল। কয়েকদিন বাদে ভদ্রলোক যখন এলেন তখন দেখলাম যে সেই ভদ্রলোকের নাক থেকে আর কোনও রকম দুর্গন্ধ আসছে না। এইজন্যে আমরা আমাদের অসুস্থতার কথা দাদাকে জানাতাম না।

মহাত্মনেরা অব্যক্তভাবে অপরের রোগ গ্রহণ করেন। অনেক সময় রোগী জানতেও পারে না যে সে মহাত্মনের কৃপালাভ করেছে। সদ্‌গুরুরূপী মহাত্মনেরা এতই করুণাময়। তাই বলে রোগমুক্তির জন্যে মহাত্মাদের নিকট প্রকাশ্যে প্রার্থনা করাও উচিত নয়। বরঞ্চ রোগমুক্তির কামনা না করে, রোগ মুক্তির পথ জেনে নিয়ে, নিজের প্রারব্ধ সৎকর্মের দ্বারা ক্ষয় করাবার পথ জেনে নিতে হয়।

প্রসঙ্গ (৩৬)

কোনও একদিন মাস্টার মশাইয়ের বাড়ীতে আমাদের কিছু গুরুভাই একসাথে বসেছিল সদ্-আলোচনা করার জন্যে; তারমধ্যে আমি (প্রদীপ চ্যাটার্জী) তখন ছিলাম না। আশীষদা, অসীমদা প্রভৃতি আরও কয়েকজন সেখানে ছিলেন। তখনও আমি গুরুমহারাজের সান্নিধ্যে আসিনি। এই মাস্টার মশাইয়ের একটু পরিচয় দিয়ে রাখি।

মাস্টার মশাইয়ের নাম শ্রীপ্রণবেশ ঘোষ; তিনি পদ্মপুকুর রেল স্টেশনের সিগ্‌নাল-ম্যান ছিলেন। পরবর্তীকালে উনি সাঁতরাগাছি রেল স্টেশনের সিগ্‌নাল স্টেশন-মাস্টার হয়ে ছিলেন। খুব দায়িত্বের সঙ্গে উনি সিগ্‌নাল্ ব্যাপারটাকে কন্‌ট্রোল

করতেন। সেইজন্যে উনি সবাইয়ের কাছে মাস্টারমশাই বলেই পরিচিত ছিলেন। উনি যে সময় আমাদের শ্রীশ্রীবাবার সান্নিধ্যে ছিলেন সেই সময় আমাদের শ্রীশ্রীমাও বাবার সান্নিধ্যে ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে শুনেছি যে মাস্টারমশাই বাবার দীক্ষিত একজন সুউন্নত ক্রিয়াবান ছিলেন। তিনি প্রায় প্রত্যহই শ্রীশ্রীবাবার সেবা করার জন্যে গুরুগৃহে আসতেন। শ্রীশ্রীমা বলেছেন যে শ্রীশ্রীবাবার নিকট লিঙ্গ-শরীরে যে অনেক মহাত্মারা নিত্য আসতেন, সেটা শ্রীশ্রীবাবা মাস্টারমশাইকে প্রত্যক্ষ করান। এই মাস্টারমশাই শ্রীশ্রীবাবার জন্মজন্মান্তরের অন্তরঙ্গ লোক। একথা অনেকেই জানত বলে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ীতে সকলে গিয়ে আধ্যাত্মিক আসর বসাত।

যাই হোক, আবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসি। সেই আলোচনায় এমন কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল যেটা হয়তো অধ্যাত্ম আলোচনার বাইরে কোনো অপ্রাসঙ্গিক কথা, হয়তো কারও সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আলোচনা; সেই আলোচনায় আশীষদা বিশেষ কোনও মন্তব্য রাখতে গেলে হঠাৎ আশীষদার গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন অনেক চেষ্টা করেও আশীষদা সেই মন্তব্য প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁর তখন মনে হল যেন গলাটা ভিতর থেকে কেউ যেন চেপে আটকে রেখেছে। যতক্ষণ আলোচনা চলল, ততক্ষণ অবধি কিছুতেই গলা থেকে স্বর বেরোল না। আশীষদা চুপচাপ বসে অগত্যা আলোচনা শুনতে লাগলেন। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার যে, আলোচনাটি শেষ হয়ে যাবার পর যখন সবাই মাস্টারমশাইয়ের দরজার বাইরে এল তখন আবার আশীষদা স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে লাগলেন! আশীষদা এর কোনও কারণ খুঁজে পেলেন না। কিন্তু হঠাৎ বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যাবার জন্যে আশীষদা ভীত হননি কারণ তিনি মনে মনে বুঝতে পেরেছিলেন যে দাদার হয়তো ইচ্ছেতেই এটা হয়েছে। পরের দিন গুরুমহারাজের নিকট যেতে উনি বললেন, ''কিরে আশীষ, মাস্টারমশাইয়ের বাড়ীতে গান-বাজনা শুনলি?'' — আশীষদা আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন কারণ, শ্রীশ্রীবাবা কিন্তু জানতেন না যে আশীষদারা মাস্টারমশাইয়ের বাড়ীতে গেছেন। এতেই বোঝা যায় যে সন্তানদের আলাপ আলোচনার মধ্যেও শ্রীশ্রীবাবা অদৃশ্যভাবে উপস্থিত থাকেন। *.....ক্রমশঃ*

—পিতৃচরণাশ্রিত শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর, হাওড়া

জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীসর্বাণীমাকে বিশেষ অনুরোধ, উনি যদি ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর ১৮টি পত্রের সাধন মার্গের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর উপর আলোকপাত ও ব্যাখ্যা 'হিরণ্যগর্ভ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন তা হলে একটা অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। পরে তা পুস্তকে রূপ দেওয়া যেতে পারে।

—শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী প্রসঙ্গেঃ—

মরমী সাধক ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর গুরুভ্রাতা শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়কে জ্ঞানগঞ্জের সাধন মার্গের ক্রিয়াযোগের যে সকল নিগুঢ় তত্ত্ব, তথ্য এবং সাধন প্রণালীর বিষয় চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তারই কয়েকটি প্রশ্ন :—

৬। পত্র ৭) প্রথম ভাগ - মহাকুণ্ডল তত্ত্ব কি? প্রকৃতি রহস্য কিভাবে উন্মোচিত হয়?

''১০৮ টি যোগক্রিয়ার মধ্যে প্রথম ১০০ টি কর্মস্তরের অন্তর্গত'' — এই কর্মস্তরগুলি কি কি? —(এর ব্যাখ্যা)

''১০৮ টি যোগক্রিয়ার ১০০ সংখ্যা অথবা অন্তিম ক্রিয়াটি সমষ্টির দ্যোতক''— (এর ব্যাখ্যা)

''তার পরবর্তী ১০১ থেকে ১০৮ টি পরবর্তী অবস্থার দ্যোতক। এর মধ্যে ১০১-বোধ, ১০২-জ্ঞান, ১০৩-ভাব, ১০৪-গুণ, ১০৫-মহাভাব, ১০৬-মহাজ্ঞান, ১০৭-মহাগুণ — এই যোগাবস্থার অনুভব ও জ্ঞানগুলির ব্যাখ্যা।

উত্তর — পত্র ৭-এর প্রথম ভাগ — মহাকুণ্ডলতত্ত্ব ও প্রকৃতি রহস্যের বিষয়ে পূর্বের প্রশ্নের উত্তরে আলোচনা করা হইয়াছে।

চিদ্‌রাজ্যে প্রবেশাধিকার হইলে পরে যোগীর বোধিতে প্রকৃতি রহস্য স্বপ্রকাশিত ভাবেই উন্মোচিত হয়। অনন্ত জ্যোতি-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম চেতনায় যোগীর বোধ গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইয়া মহাগুণময় যোগমায়া এবং তৎসম্বন্ধিত মহাগুণহীন গাঢ় অন্ধকার অলখ ব্রহ্মরূপ অনন্ত অখণ্ড পরমব্রহ্ম রূপের বোধকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। সেই বিশুদ্ধ জড় রূপ সৎ-এর মধ্যে যখন

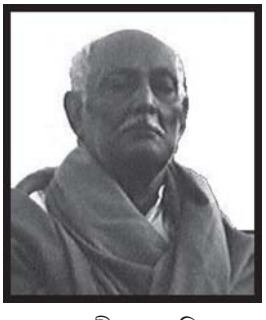

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

যোগীর বোধ নিমজ্জিত হয়, তখন সেই সৎ-এর ভূমিতেই চিৎ-এর স্পন্দন যখন স্বপ্রকাশিতভাবে উত্থিত হয়, তখনই যোগী পুনঃ আপন অস্তিত্ববোধের মধ্যে ফিরিয়া আসেন এবং আবার মহাগুণময় জ্যোতিঃব্রহ্মকে উপলব্ধিকরতঃ সৎ, চিৎ, আনন্দের ক্রমানুযায়ী ভূমিতে অবগাহন করিতে সক্ষম হন এবং ক্রমশঃ সেই অবস্থায় অধিকক্ষণ বিচরণ করিতে করিতে মহাগুণময় সগুণব্রহ্ম এবং মহাগুণহীন নির্গুণব্রহ্মের মহামহাজ্ঞান আহরণ করিতে পারেন। ঐ সগুণব্রহ্মময় মহাগুণময় অবস্থাই হইল যোগমায়া দ্বারা পরিচালিত দিব্য জগৎ, নিত্য জগৎ। এইখানেই মহাভাব পরিপুষ্টিলাভ করিয়া তৎপরবর্তী পুরুষোত্তম পরম ভাবের উদ্রেক করে যোগীর আত্মসত্তার বোধে। তাই বলা হইয়াছে ১০৮ টি স্বতন্ত্র, উহা পুরুষোত্তম ভাবের নির্দেশক। ১০৮-এ যোগীর পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যরূপ চিদ্‌সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠা হয়। ১০৭-এ মহাগুণ পরম সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ১০৮-এ পুরুষোত্তম অবস্থার বোধ-চেতনাকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। মহাযোগীশ্বর ভিন্ন ঐ সকল স্তরকে কেহই অতিক্রম করিতে পারেন না। ১০৭-এর পরম সাম্যাবস্থায় উপনীত হইয়া যোগীশ্বরগণ ভেদাভেদ ভাব রহিত হইয়া পূর্ণ অদ্বৈত পরমব্রহ্ম স্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে সক্ষম হন। তারপরে অদ্বৈত এবং দ্বৈত এই উভয়বিধ মহাভাবে যোগীশ্বর চিদ্‌রাজ্যে চিদ্ সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার সামর্থ্য অর্জন করেন। এই সময়েই মহাকুণ্ডল তন্ত্রযোগের আবশ্যকতা যোগীশ্বর অনুভব করেন। কারণ, মহাকুণ্ডল তন্ত্রযোগ কৌশল অবলম্বন ভিন্ন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ মহাশূন্য বক্ষে চিদ্‌রাজ্য স্থাপন করা সম্ভব নহে এবং মহাকুণ্ডল ব্যতিরেকে উহা হইতে বাহির হইবার পথের সন্ধানও পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। — যোগীশ্বর চিদাকাশে আপন উড্ডীন সত্তা লইয়া বিরাজিত থাকেন। মহাশূন্যের মধ্যে রাজ্য স্থাপন করিয়া উহার অধিষ্ঠাতা হওয়াই মহাযোগীশ্বরের লক্ষ্য হয়। পরমব্রহ্ম প্রকৃতির রহস্য পরিপূর্ণ অবগত হইলে পরেই মহাযোগীশ্বর চৈতন্যময় শূন্যবক্ষে অবস্থান করিতে সক্ষম হন।

'১০৮ টি যোগক্রিয়ার মধ্যে প্রথম ১০০ টি কর্মস্তরের অন্তর্গত'; এই সকল কর্মস্তরগুলি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ চেতনাকে অবলম্বন করিয়া সাধিত হয়। পতঞ্জলির যোগসাধন কৌশলগুলি এই কর্মস্তরের অন্তর্গত। ইহা অতীব গুপ্ত এবং সদ্‌গুরু বক্ত্রগম্য; ঐ সকল যোগকৌশলগুলিকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াই মুনিঋষিগণ চিহ্নিত করেন। এই আত্মকর্ম সম্বলিত যোগবিদ্যা রূপ কৌশলের মধ্যে হঠ্‌যোগাদির ৮৪ প্রকার আসনও গ্রথিত আছে; এই ৮৪ প্রকার আসনগুলি জগতে সাধারণের নিকট ব্যক্ত হইয়াছে কিন্তু অন্য ২৪ প্রকার আসনগুলি গুরু বক্ত্রগম্য ও গুপ্তভাবে রক্ষিত আছে। ঐ সকল গুপ্ত ২৪ প্রকার আসনগুলির মধ্যে রুদ্রাসন, মণিপুরাসন, গুপ্তবীরাসন, গুপ্ত বজ্রাসন ইত্যাদি আসনাদি রহিয়াছে। এই সকল আসনের বিজ্ঞান এবং স্বরূপ সদ্‌গুরু মুখে অবগত হইয়া আপন উপলব্ধি অনুভূতির সহায়তায় জ্ঞানগম্য করিতে হয়। আত্মসত্তায় প্রত্যেকটি 'আসন' সাধনা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ চেতনার দেহে প্রাণের সমরস্যতা আনে, যারফলে যোগী সাধকের আধারে তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে মলমুক্ত হইয়া দেহাভ্যন্তরস্থ নাড়ীগুলি শোধিত হইয়া যায়; ইহাতে যোগীর আসন-শুদ্ধি, ভূত-শুদ্ধি, আধার-শুদ্ধিকরণ সম্পূর্ণ হয়। ইহার ফলে যোগীর চেতনা জ্যোতিষ্মতী অবস্থায় স্থিতিলাভ করতঃ আত্মজ্যোতির আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া প্রজ্ঞাজ্যোতিতে স্নাত হয়। তখন প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান অবস্থায় যোগী সিদ্ধ হইয়া যান। যতক্ষণ ধ্যান হয় ততক্ষণই কর্ম; অন্তরে অন্তরে গভীরে গহনে এইভাবে মানসভূমিতে চেতনা লইয়া যোগকৌশলে যোগী ক্রমশঃ আত্ম-উপলব্ধির ভূমিতে স্থিরপ্রাণের ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া আত্মতত্ত্বের জ্ঞান আহরণ করিত সক্ষম হন। এগুলি সবই পরাবস্থার বিষয়। আত্মবিন্দুতেই যোগীর 'এক' বা 'একশত' পূর্ণ হয়। কারণ আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। যোগ সাধনার কর্মস্তরগুলি প্রধানতঃ তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানের অন্তর্গত। ১০০ সংখ্যা বা কর্মস্তরের অন্তিম ক্রিয়াটি ব্যষ্টি চেতনা, অর্থাৎ নিজ সত্তার ঘটস্থ সীমিত চেতনা এবং সমষ্টি চেতনা অর্থে বিশ্বচৈতন্য সসীম হইতে অসীমের পানে যেটি ধাবিত হয়। কর্মস্তরের উন্নত অবস্থায় যোগীর হয় অনুভূতির সূচনা। এই অনুভূতি বোধে পরিণত হয় সমাধির সূচনায়। সমাধির ব্যাখ্যা পতঞ্জলি-যোগে খুব স্পষ্টভাবে বলা আছে। সমষ্টি চেতনার প্রকাশেই বোধচেতনা জাগ্রত হয়। স্থির বুদ্ধি হইতেই বোধ অবস্থা বিকশিত হইয়া প্রজ্ঞায় পর্যবসিত হয়। এই স্থির বুদ্ধিই হইল মেধা শক্তি। সেই কারণেই বলা হইয়াছে ১০১-এ বোধ, ১০২-এ জ্ঞান, ১০৩-এ ভাব, ১০৪-এ গুণ, ১০৫-এ মহাভাব, ১০৬-এ মহাজ্ঞান, ১০৭-এ মহাগুণ। নির্মল চিত্তাকাশে শুদ্ধ চিত্তে যে সকল বিষয় আত্মবোধের মধ্য দিয়া উপলব্ধি হয় সেগুলিকেই 'বোধ' বলা হয়। গোপীনাথ কবিরাজজীর ভাষায়, ''বোধ বলিতে 'একটি মহাসত্তার আভাস চৈতন্য মাত্র প্রকট', ইহাই বুঝিতে হইবে।'' আত্মসত্তার বক্ষে বোধ জাগ্রত হইলেই তখন আপনা হইতেই জ্ঞানের বিকাশ হয়। তাই 'বোধ' ১০১ আর জ্ঞান ১০২; জ্ঞান যতই স্বচ্ছ হয় ততই যোগী প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হন। 'বোধ' অবস্থার পরেই

'জ্ঞান' আসে কারণ প্রগাঢ় ধ্যানের ভিতরেই সমাধির সূচনা হয়। বোধের পরিপক্ক অবস্থাই জ্ঞান। জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থা হইল 'ভাব' অর্থাৎ বিশুদ্ধভাব। বিশুদ্ধভাব সত্তার তিনগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণকেও বিশুদ্ধ পর্য্যায়ে লইয়া যায়। ত্রিগুণ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইলে পরে সমাধি অবস্থায় যোগী শিবাবস্থা লাভ করেন। ইহা সাধন স্তরের সপ্তম ভূমি। ১০৫-এ শিবাবস্থায় যোগী হৃদয়ে মহাভাবের সঞ্চার হয়; এখন যোগী বিশ্বের পূর্ণজ্ঞান অর্জন করিয়া শিবস্বরূপ হইয়া যান। তৎপরে মহাভাবের স্ফুরণে মহাজ্ঞানের প্রকাশ যোগীসত্তায় আসিতে থাকে। মহাভাবের আতিশয্যে যোগীশ্বর তখন অষ্টম ভূমিতে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়া মহাজ্ঞানের (১০৬) আলোকে আলোকিত হন এবং তারপরেই নবম ভূমিতে যাইয়া যোগী হন 'পরমশিব'। পরমশিব অখণ্ড অনন্ত মহাজ্ঞানের অধিকারী হন। ১০৭-এ যাইয়া তখন 'সমাধি' হইতে বুত্থান অবস্থালাভ করিয়া যোগীশ্বর নির্গুণ-সগুণ রূপ মহাগুণ সম্বন্ধে পরমবোধিতে পরমজ্ঞানের ভূমিতে উপনীত হন। পরমশিবাবস্থার এই স্তরকেই 'নবমুণ্ডি' মহাসন বলা হয়। সপ্তম ভূমি (১০৫) হইতেই 'মহাকুণ্ডল চক্র' রচনা আরম্ভ হইয়া যায়। *—যোগ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা*

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

গুরুগীতা

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ যৌগিক ও সাধারণ অর্থ সম্বলিত)

যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৪)

সপ্তসাগরপর্য্যন্ত তীর্থস্নানাদিকৈঃ ফলম্।
গুরোরঙ্ঘ্রি জলং বিন্দুং সহস্রাংশেন দুর্ল্লভম্।। ৪৯

সপ্তসাগরপর্য্যন্তং তীর্থস্নানাদিকৈঃ যৎ ফলং (নির্দ্দিষ্টং তস্মাৎ) গুরোরঙ্ঘ্রি সম্ভূতং বিন্দুমাত্রং জলং (তুলনয়া) সহস্রাংশেন দুর্ল্লভং (বিদ্ধি)।। ৪৯

ব্রহ্মপদ নিঃসৃত বিন্দুমাত্র জলসেবনে (অমৃতবিন্দু পানে) যে ফল হয়, তাহার সহস্রাংশের একাংশ ফল ও সপ্তসাগর পর্য্যন্ত তীর্থ স্নানাদি দ্বারা হয় না (কারণ ব্রহ্মচর্য্যই পরম তীর্থ বলিয়া কথিত হয়। যথা — ব্রহ্মচর্য্যপরং তীর্থম্ - ইতি কাশীখণ্ডঃ। উৎপত্তি স্থানই পরমতীর্থ, ব্রহ্মই জীবের উৎপত্তিস্থান, সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য পরমতীর্থ হইতেছে)।। ৪৯

গুরুপাদোদক — অর্থাৎ ক্রিয়াকালে হংসরূপ গুরুপদ পূজায় যে আনন্দরস অনুভূত হয়, উহাই গুরুপাদোদক। অথবা ক্রিয়ান্তে ক্রিয়ার পরাবস্থায় যে শান্তিরস অনুভূত হয়, উহাকেও গুরুপাদোদক কহে। কূটস্থব্রহ্মই পরব্রহ্মের পদস্বরূপ, এবং হংস কূটস্থব্রহ্মের পদ। কূটস্থব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মে কোন প্রভেদ নাই, উহারা অভেদেই আছেন; যথা — (জন ১ম অঃ ১ম শ্লোক দেখ —In the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was God.!)

গুরুরেব জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি, তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ গুরুম্।।৫০

ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকং সর্ব্বং জগৎ গুরুরেব, গুরোঃ পরতরং নাস্তি, তস্মাৎ গুরুং সম্পূজয়েৎ।। ৫০

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে সৃজন করিতেছেন, বিষ্ণু পালনকর্ত্তারূপে সৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন, এবং শিবরূপে সৃষ্টির ধ্বংসসাধন হইতেছে; এই দেবতাত্রয় দ্বারা সৃষ্ট জগতের কার্য্য চলিতেছে, পরন্তু ইঁহারা কে? ইঁহারা তাঁহারই স্বরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং কর্ম্মশূন্যদেব হইতে তাঁহারা দেবতারূপে অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন। পরন্তু মূলকারণ হইতেছেন সেই রূপাতীত সূক্ষ্মব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম ব্যতিরেকে তাঁহাদের স্বতন্ত্র কোন সত্তাই নাই, সে কারণ অক্ষরব্রহ্মের স্বরূপ কূটস্থব্রহ্মাই একমাত্র পূজার্হ।। ৫০

জ্ঞানং বিনা মুক্তিপদং লভতে গুরুভক্তিতঃ।
গুরোঃ পরতরো নাস্তি ধ্যেয়োঽসৌ গুরুমার্গিনা।। ৫১

জ্ঞানং বিনা গুরুভক্তিতঃ মুক্তিপদং লভতে, গুরোঃ পরতরঃ নাস্তি, (অতএব) গুরুমার্গিনা অসৌ (গুরুরেব) ধ্যেয়ঃ।। ৫১

একমাত্র গুরুতে অবস্থিতির দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়, কারণ গুরুই জ্ঞানের স্বরূপ, সুতরাং অন্যভাবে জ্ঞান লাভের চেষ্টা না করিয়া, একমাত্র গুরুভক্তির দ্বারা একান্তভাবে গুরুতে অবস্থিতি দ্বারা মুক্তিপদ পাওয়া যায়। সুতরাং গুরুপথাবলম্বীদের একমাত্র গুরুধ্যানই বিধেয়, কারণ গুরুর অধিক আর কিছু নাই।। ৫১ *...ক্রমশঃ*

(কলিকাতা—আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী

শ্রীঅমরেন্দ্র চন্দ্র শ্যামের গ্রন্থনায়, 'অখণ্ড মহাপীঠ' দ্বারা প্রকাশিত ভগবান শ্রীশ্রীকিশোরী মোহনের জীবনী গ্রন্থ 'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত'-এর অন্তর্গত ভগবান কিশোরী মোহনের অমূল্য আধ্যাত্মিক উপদেশ সমৃদ্ধ পত্রাবলীর থেকে নিম্নলিখিত পত্রটি উদ্ধৃত করা হল।

পত্র নং (৫)

ওঁ

প্রণবাশ্রম, কাশীধাম
২৪শে মাঘ, ১৩৪৫ বাং

শ্রীমান ক্ষিতীশ - পরম কল্যাণীয়েষু,

তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার উত্তর দিতেছি। যথা - যিনি জ্ঞান ও মুক্তির জন্য সাধন করেন, তাঁহার যে কোন সাধন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে তিনি চিত্তকে আত্মস্থ করিয়া অগ্রে আত্মার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন, পরে সাধন দ্বারা ক্রমশঃ আত্মাকে প্রাপ্ত করেন। যাহাদের চিত্ত সত্ত্ব কিঞ্চিৎ রজোগুণ সংযুক্ত থাকে, তাহাদের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হয়। তখন তাঁহারা দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধ্যান-সমাধি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যথা - কণ্ঠকূপে ধ্যান বা সমাধি দ্বারা ক্ষুধা পিপাসাদির নিবৃত্তি হয়। 'কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তিঃ' — যোগদর্শন, বিভূতিপাদ। কণ্ঠকূপের অধঃ কূর্ম্মনাড়ী অবস্থিত। তাহাতে ধ্যান-সমাধি দ্বারা চিত্ত স্থৈর্য্য প্রাপ্তি হয়। 'কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যং'।

যাহারা পঞ্চ স্থূলভূত ও সূক্ষ্মভূতে ধ্যান-সমাধি অভ্যাস করেন, তাহাদের অগ্রে ঐশ্বর্য্যাদির উদয় হয়। সমস্ত ঐশ্বর্য্যই অবিদ্যার ক্ষেত্রস্থ। যে সকল যোগী-মূলাধার হইতে ক্রমান্বয়ে ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ পদে মনোনিবেশ পূর্ব্বক ধ্যানাভ্যাস করেন, তাহাদের অগ্রে ঐশ্বর্য্যের উদয় হয়। মূলাধার হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, স্থূল ও সূক্ষ্মভূতের স্থান। স্থূল ও সূক্ষ্মভূত আয়ত্তীভূত হইলে ঐশ্বর্য্যের উদয় হয়। ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির মূলে ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা। যাহারা জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী তাহাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়া সেই চিত্তকে আত্মায় স্থিত করেন। চিত্ত সত্ত্ব-রজোগুণসম্পন্ন হইয়া ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ এবং সত্ত্বস্থ এবং আত্মস্থ থাকিয়া আত্মপ্রকাশ। জ্ঞান প্রকাশের অগ্রে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হইলে চিত্ত প্রলুব্ধ হইয়া সেই ব্যাপারে ধাবিত হয় এবং ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া আমার যথেষ্ট লাভ হইল বলিয়া কল্পনা করে। পরে যদি তাঁহার জ্ঞানোদয় হয়, তখন ঐশ্বর্য্য তাঁহার নিকট হেয় ও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। এই সকল ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে তাহারা জ্ঞানোদয় প্রতিবন্ধক। কারণ সমস্ত ঐশ্বর্য্যের গতি আত্মা হইতে বহিস্থ এবং জ্ঞানের গতি আত্মস্থ। অতএব মুক্তিকামী সাধকগণকে ঐ বিষয়ে সতর্ক করা উচিত। ঐশ্বর্য্য যে কেবলমাত্র ধ্যান-সমাধি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা নহে। অন্যান্য উপায় দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগদর্শনের কৈবল্যপাদে প্রথম সূত্রে আছে —

'জন্মৌষধি মন্ত্রতপঃ সমাধিজা সিদ্ধয়ঃ।'

ইহার অর্থ - জন্ম, ঔষধি, তপস্যা ও সমাধি এই সকলের প্রত্যেকটি হইতে সিদ্ধি বা ঐশ্বর্য্যের উদয় হয়।

জন্ম হইতে হয় কিরূপে? কেহ পূর্বজন্মে ঐশ্বর্য্যের জন্য সাধন করিয়াছে। কিন্তু দৈহিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকবশতঃ ঐশ্বর্য্যের উদয় হয় নাই, পরজন্মে ঐ সকল প্রতিবন্ধক না থাকায় ঐ জন্মে বিনা সাধনে তাহার ঐশ্বর্য্যের উদয় হয়। ইহাকে জন্মগত সিদ্ধি বলে।

তাহার পর ঔষধি — দ্রব্যগুণ দ্বারা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়। কোন বৃক্ষের মূল শরীরে ধারণ, ভোজন বা মুখে রাখা হইতে ঐশ্বর্য্যের উদয় হয়। এইরূপে মণিরত্নাদি ধারণ দ্বারাও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়।

তাহার পর মন্ত্র — বিশেষ বিশেষ মন্ত্র জপদ্বারা এক একরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। বিনা ধ্যান-সমাধিতেও এই সকল মন্ত্রদ্বারা ঐশ্বর্য্যের উদয় হয়। পরে তপঃ বা তপস্যা দ্বারাও হয়।

শারীরিক কষ্টসাধ্য শাস্ত্রোক্ত ব্যাপার দ্বারা ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র হইতে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধি হয়। পরে সমাধি দ্বারাও হয়। সমাধি দ্বারা ধ্যান ও সমাধি উভয়ই সূচিত হয়। এতৎ সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে।

সমগ্র ঐশ্বর্য্যের উদয় হইয়াও জ্ঞানোদয় না হইতে পারে।

জ্ঞানোদয়ের পূর্বে সমগ্র ঐশ্বর্য্যের উদয় না হইতে পারে কিন্তু কিছু কিছু ঐশ্বর্য্যের উদয় প্রায় সকল দেহেই হইয়া থাকে।

জ্ঞানোদয়ের পর ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। আকাঙ্ক্ষা যদি হয়, তবে তিনি তাহা পাইয়া থাকেন। কিন্তু প্রায়ই এরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকে না। মৃত্যুর পরে জীব ঈশ্বরের সর্বৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরমাত্মা স্বভাবতঃ নির্গুণ। কিন্তু মায়া সংযোগে তাঁহার ঈশ্বরত্ব হয়। এজন্য শ্রুতিতে ও অন্যান্য শাস্ত্রে পরমাত্মার নির্গুণত্ব ও সগুণত্ব এই উভয় রূপত্ব বর্ণিত আছে। জীবও বিদেহমুক্ত হইয়া পরমাত্মার সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব এই উভয় রূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জগতের একমাত্র আত্মা, তাহাই পরমাত্মা। (এই অবস্থা সম্পর্কে আচার্যগণের মধ্যে মতভেদ আছে।) তাঁহারা কখনও কখনও সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া উপদেশাদি দ্বারা জগতের কল্যাণ-সাধন করিয়া থাকেন। আমার মত এই—তাঁহারা পরমাত্মার সহিত একাত্ম থাকিয়া ঐরূপ ক্রীড়া করেন। তাঁহাদের কার্য্যাদি ভগবৎলীলার অন্তর্গত। একাগ্রতা প্রযুক্ত পরমাত্মার সহিত তাঁহাদের সঙ্কল্পে বিরোধ থাকে না। অতএব একমেবাদ্বিতীয়ং; সকল বিচার মধ্যে এই মহান শ্রুতি-বাক্যের স্মরণ রাখা উচিত। দেহ থাকিতে যদি অভেদ ভাব উদ্ভাসিত হয়, দেহান্তে তাহা অবিদ্যার সমূলনাশে আরো গাঢ়তর ও স্থিরতর হইবারই কথা। অতএব একমেবাদ্বিতীয়ং। কেবল-মাত্র ঐশ্বর্য্যলাভে মুক্তি হয় না। জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই। আমি তোমাকে সংক্ষেপে এই সকল বিষয় বলিলাম।

ইতি —

শ্রীকিশোরী মোহন

('বৃহৎ কিশোরী ভাগবত' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত)

পুরাণ কথা

দেবরাজ শতক্রতু

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য দেবগণের সহায়তায় অসুরগণকে পরাজিত করিলে পরে, ক্রমে ক্রমে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাহার ফলে তিনি 'শতক্রতু' নাম প্রাপ্ত হন।

একবার শুক্র, অঙ্গিরা, কবি, অগস্ত্য, নারদ, পর্বত, ভৃগু, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, গালব, অষ্টাবক্র ও ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহর্ষিগণ, বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী, বালখিল্য মুনিগণ এবং শিবি, দিলীপ, নহুষ, পুরু, অম্বরীষ, যযাতি, ধুন্ধুমার প্রভৃতি রাজর্ষিগণ শতক্রতুর সহিত প্রভাস তীর্থে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহারা মন্ত্রণা করিয়া বহুতীর্থ পর্যটন করিতে করিতে মাঘী-পূর্ণিমা তিথিতে কৌশিকতীর্থে উপস্থিত হন। তারপর সেখানের ব্রহ্মসর নামক পবিত্র সরোবরে অবগাহন করিয়া সরোবরে প্রস্ফুটিত মৃণাল সমূহ উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মহর্ষি অগস্ত্য কিছু মৃণাল উদ্ধার করিয়া তীরে রাখিয়াছিলেন, সে সমুদয় সহসা অন্তর্হিত হইয়া যায়। আলোচনা ও অনুসন্ধানের পরে কে মৃণাল অপহরণ করিল তাহা কিছুতেই যখন নির্ণীত হইল না, তখন সকলে শপথপূর্বক নিজ নিজ নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন। সকলেরই শপথ করা সমাপ্ত হইলে পরে শতক্রতু শপথ করিবার ছলে বলিলেন, ''যে মহর্ষি অগস্ত্যের মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে চরিত-ব্রতচর্য্য-যজুর্বেদী বা সামবেদী ব্রাহ্মণকে কন্যাদান, অথর্ব বেদের অধ্যয়ন করিয়া স্নান, সমুদয় বেদ অধ্যয়ন, পুণ্য সঞ্চয়, ধর্মানুষ্ঠান ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হউক।'' শতক্রতুকে এইরূপ শপথ করিতে দেখিয়া মহর্ষিগণ বলিলেন, ''যেহেতু তুমি শপথ ছলে নিজের মঙ্গলই কামনা করিলে, তখন তুমিই মহর্ষির মৃণাল অপহরণ করিয়াছ।'' তখন শতক্রতু বলিলেন যে, তিনি লোভবশতঃ মহর্ষির মৃণাল অপহরণ করেন নাই। মহর্ষিগণের ধর্মকথা শ্রবণ করিবার জন্যেই তিনি ঐ উপায় অবলম্বন করেন, তজ্জন্য মহর্ষিরা যেন তাঁহার অপরাধ মার্জনা করেন। শতক্রতুর বাক্যে মহর্ষি অগস্ত্য তখন তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া নিজ মৃণাল গ্রহণ করিলেন।

উপরিউক্ত সত্য কাহিনী হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে সাধারণতঃ সকলেই নিজ স্বার্থজনিত লাভার্থেই কর্ম করিতে ইচ্ছুক হয়। নিজ লাভ চিন্তা করিয়া অপরের অসুবিধা বা ক্ষতি করা কখনোই উচিত নয়। যে নিষ্কামভাবে ভগবানকে ভালোবাসে, সে প্রকৃতই ভগবানের সেবক হয়। সাধারণতঃ যাঁহারা নিজ লাভ ক্ষতি চিন্তা না করিয়া পরোপকার করে তাহারাই পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে। এক্ষেত্রে দেবরাজ ধর্ম উপদেশ লাভার্থেই অগস্ত্যের মৃণাল অপহরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ঋষির নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হন। ধর্ম উপদেশ সাত্ত্বিক শিক্ষা বিশেষ, সেই কারণেই ঋষিগণ দেবরাজকে ক্ষমা করিয়া আশীর্বাদ করিলে শতক্রতুর ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। (*সহায়ক গ্রন্থ — মহাভারত, অনুশাসন পর্ব -৯৪*)

শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব বদরিকাশ্রমে সহস্র বৎসর ব্যাপী কেবল এক সনাতন মহেশ্বরের আরাধনা করিয়াই তাঁহার প্রসাদে জগদ্বিখ্যাত ও সর্বভূতের প্রিয়তম হইয়াছিলেন। তিনি প্রতি যুগেই অবিচলিত ভক্তিভাবে সেই শাশ্বত চরাচরের গুরুস্বরূপ মহাদেবেরই আরাধনা করিয়া থাকেন। তিনি দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপঃব্রত অনুষ্ঠান পূর্বক মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে দেবী রুক্মিণীর গর্ভে কতিপয় মহাবল পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। মহাবীর প্রদ্যুম্ন নিহত হইলে পরে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া গেলে কৃষ্ণের অন্যতম মহিষী জাম্ববতী তাঁহার নিকটে একটি মহাশক্তিশালী পরাক্রান্ত পুত্র প্রার্থনা করিলেন। দেবী জাম্ববতীর প্রার্থনা পূরণ করিবার মানসে তিনি মহাদেবের আরাধনা করিতে চলিয়া যান। তিনি প্রথমে মহর্ষি উপমন্যুর আশ্রমে উপনীত হন এবং তাঁহার নিকটে মহাদেবের অপার মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া এবং অবগত হইয়া, তাঁহারই উপদেশে তথায় মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হন। মহর্ষি উপমন্যু বাসুদেবের মস্তক মুণ্ডন এবং তাঁহাকে দণ্ড, কুশ, চীর ও মেখলা গ্রহণ করাইয়া শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে দীক্ষিত করেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ একমাস ফলাহার ও চারি মাস জলপানপূর্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে অবস্থান করিলেন। অনন্তর ছয়মাস অতিবাহিত হইলে, দেবদেব মহাদেব পার্বতীসহ আকাশে এক মেঘ মধ্যে অবস্থানপূর্বক তাঁহার সামনে আবির্ভূত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ পরম ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে আটটি বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট ধর্মে দৃঢ়তা, রণস্থলে শত্রুনাশের ক্ষমতা, পরম যশঃ, বল, যোগ, লোকপ্রিয়তা, পরমেশ্বরের সান্নিধ্য ও অসংখ্য পুত্র প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব প্রীত হইয়া বাসুদেবের সকল প্রার্থনাই পূর্ণ করিলেন। তারপর দেবী পার্বতীও প্রসন্না হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্নতা, পিতার অনুগ্রহ, শতপুত্র, উৎকর্ষ, ভোগ, কুলানুরাগ, মাতার নিকট প্রসন্নতা, শান্ত ভাব ও কার্য্যে নিপুণতা, এই অষ্টপ্রকার বর প্রদান করিলেন। ইহা ভিন্ন পার্বতী বলিলেন যে বাসুদেব অমরগণতুল্য প্রভাব, সত্যানুরাগিতা, ষোড়শ সহস্র ভার্য্যা, তাহাদিগের অনুরাগ, অক্ষয় ধন-ধান্য, বন্ধুগণের প্রীতি ও মনোহর শরীর লাভ করিবেন।

এই সময়ে নারদ, পর্বত, ব্যাসদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যে বদরিকাশ্রমে গমন করেন। বাসুদেব সমাগত মহর্ষিগণকে যথোচিত সৎকার করিলে, উহারা নানাবর্ণ আসনে উপবেশন করিয়া ধর্মালোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। তখন হঠাৎ বাসুদেব নারায়ণের বদন হইতে ব্রহ্মচর্য্যজনিত তেজোরাশি বহির্গত হইয়া সমাগত সকল মহর্ষিগণের সমক্ষেই শ্বাপদ-সংকুল, বৃক্ষলতাদি সমাকীর্ণ পর্বত সকল দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ সেই তেজঃ-অগ্নিশিখা পর্বতের শিখর সমুদয় ভস্মীভূত করিয়া শিষ্যের ন্যায় বাসুদেবের নিকট সমাগত হইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই পর্বতকে দগ্ধপ্রায় দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখনই সেই পর্বত পূর্ববৎ বৃক্ষলতা সমাকীর্ণ ও পশুপক্ষী-শ্বাপদাদি সংকুল হইয়া উঠিল। মহর্ষিগণ সেই অতি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তখন বাসুদেবকে ঐ সমস্ত ঘটনার রহস্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের কৌতুহল নিবারণের জন্য তখন বাসুদেব বলিলেন যে মহর্ষিগণ প্রলয়াগ্নির ন্যায় যে তেজ শ্রীকৃষ্ণের বদন হইতে নির্গত হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহা হইল তাঁহার 'বৈষ্ণব' তেজ। আত্মতুল্য পুত্রলাভার্থ তিনি ঐ পর্বতে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার দেহস্থিত আত্মা অগ্নিরূপে নির্গত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিল। পরে মহাদেবের তেজের অর্দ্ধাংশ তাঁহার পুত্ররূপে পরিণত হইবে; ব্রহ্মার নিকট এই বিষয় শ্রবণ করিয়া, সেই অগ্নিরূপী আত্মা পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া শিষ্যের ন্যায় তাঁহার পদবন্দনা করিয়া তখন শান্তভাব অবলম্বন করিল।

যেহেতু মহাদেব অম্বিকার সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুত্রবর দিয়াছিলেন, সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ ঐ শিবদত্ত তনয়ের নাম রাখেন 'সাম্ব'।

(সহায়ক গ্রন্থ ঃ বিভিন্ন পুরাণ ও মহাভারত-অনুশাসন পর্ব)

আশ্রমের আগামী অনুষ্ঠান সূচী

বুদ্ধ পূর্ণিমা — ১০ই মে, বুধবার
আধ্যাত্মিক সভা — ২৫শে জুন, রবিবার
গুরু পূর্ণিমা — ৯ই জুলাই, রবিবার

রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধা শ্রীশ্রীসতীমায়ের লীলামৃত

(৫)

বাপজীর প্রথম পরীক্ষা এবং নৌখা গমন — বাপজীর সতী হইবার প্রয়াস এবং তাহার পরবর্তী ঘটনাবলী লোকের

মুখে মুখে প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সংবাদ শ্রীগোলাপদাসজী মহারাজের নিকটও পৌঁছিল। তিনি ইহার সত্যতা নির্ণয় করিবার জন্য বালা গ্রামে আসিয়া তথাকার পুকুরপাড়ে একটি বৃক্ষ তলায় ডেরা বাঁধিলেন। বাপজী এই সংবাদ পাইয়া কাকিসাকে সঙ্গে লইয়া গোলাপদাসজীর নিকট যাইতেন এবং তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিয়া আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সদুত্তর লাভ করিতেন।

কিছুদিন বালা গ্রামে থাকিয়া গোলাপদাসজী পুনরায় নৌখা চাঁদাবতা রওনা হইলেন। নৌখা যাইয়া গোলাপদাসজী তথাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বলিলেন যে, বাপজী পানাহার ছাড়িয়া দিয়াছেন। তথাকার জমিদার ফতে সিংহজী একথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি তখন গোলাপদাসজী মহারাজকে প্রস্তাব দিলেন যে, বাপজীকে যদি নৌখা আনা যায় তাহা হইলে তাঁহার প্রতি পূর্ণ নজর রাখিয়া ইহার সত্যতা যাচাই করা যাইবে।

এইরূপ কথাবার্তার পর ঠাকুর ফতে সিংহজী, তাহার মাতা এবং গোলাপদাসজী মহারাজ বালা গ্রামে আসিলেন এবং তাহার সহিত বাপজীর নৌখা গ্রামে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। এই প্রস্তাবে কাকিসার সম্মতি লইয়া বাপজী তাহাদের সহিত নৌখা গ্রামে আসিলেন।

এই ফতে সিংহের ছোট ভাই পন্নে সিংহজী ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। তিনি এই সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। নৌখা আসিলে বাপজীকে বস্তুতঃ একটি কক্ষে বন্দী করিয়া রাখা হইল। পন্নে সিংহজী নিশ্চিত হইবার জন্য ঐ কাম্‌রার চারিদিকে পুলিশ প্রহরা বসাইলেন। বাপজী কিন্তু বিনা প্রতিবাদে ইহা মানিয়া লইলেন। এইভাবে পরীক্ষা করিয়া তাহারা যখন দেখিলেন যে, এতদিন আহার ও পানীয় বিনা বাপজী একই প্রকার দিব্যভাবে আছেন। তাঁহার শরীরে কোন প্রকার অনাহারের প্রভাব পড়ে নাই, তখন তাহারা বাপজীর প্রতি পরম শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে লাগিলেন এবং এমন একজন মহাসতীর সঙ্গলাভ করিবার জন্য তাঁহাকে নিজেদের নিকট রাখিতে চাহিলেন।

এইভাবে দীর্ঘদিন বাপজীর ফিরিবার কোন লক্ষণ না দেখিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কাকিসা, ভঁবর সিংহ এবং তৎসহ গ্রামের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ও একজন পুরোহিতকে নৌখা পাঠাইলেন। কিন্তু তাহারা সেখানে পৌঁছিবার পর ভঁবর সিংহকে বা অন্যান্য কাহাকেও বাপজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইল না। তাহাদের বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া কাকিসা তখন গ্রামের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে লইয়া নিজেই একটি তরোয়ালসহ অতি দ্রুত রেলযোগে তথায় পৌঁছাইলেন। কিন্তু ভঁবর সিংহের মতই তাঁহার প্রতিও আচরণ করা হইল। তখন কাকিসা উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়া খোলা তরবারি হস্তে গোলাপদাস মহারাজজীর সমীপে যাইয়া বলিলেন, ''সাধু আমার এই তরোয়ালে তোমার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া তোমার জটা দিয়া দড়ি বানাইব। শীঘ্র বল আমার লোক কোথায় আছে?'' কাকিসার ঐ উগ্ররূপ দর্শন করিয়া উপস্থিত সাধুরাও ভীত হইয়া পড়িলেন। গোলাপদাসজী মহারাজ তখন শান্ত ও নম্র মধুর স্বরে কাকিসাকে বুঝাইতে লাগিলেন এবং একজন শিষ্যকে পাঠাইয়া বাপজীকে আনিবার ব্যবস্থা করিলেন। বাপজী ভাল আছেন দেখিয়া কাকিসা তখন শান্ত হইলেন। তখন গোলাপদাসজী মহারাজ কাকিসাকে কিছুদিন থাকিয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কাকিসাও তথায় কিছুদিন থাকিয়া সৎসঙ্গ করিলেন। তাহার লোকজন চলিয়া গেল। কাকিসা সৎসঙ্গ করিয়া প্রভূত আনন্দলাভ করিলেন। তারপর গোলাপদাস মহারাজজী তাঁহার কয়েকজন শিষ্যসহ তাহাদের বালা গ্রামে পৌঁছাইয়া দিলেন। বাপজীর ইচ্ছানুসারে পথে তাঁহারা কয়েকদিন বাপজীর পিত্রালয়ে রাবনিয়া গ্রামে আসিলেন। তথাকার লোকেরা তাঁহার সতী হইবার ঘটনাদি লোকমুখে অবগত ছিলেন। তাই মহানন্দে সকলেই তাঁহাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। বাপজী যাহাকে তাঁহার প্রথম গুরু বলিয়া মানিতেন, সেই তাঁহার জ্যেঠামশায় চন্দ্রসিংহজী তখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার আদরের রূপা কঁবরের এই উচ্চ অবস্থা দেখিয়া আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় পুকুরপাড়ে এক বিরাট সৎসঙ্গের আয়োজন করা হইল। তথায় সকলেই আনন্দে অভিভূত হইয়াছিলেন। সকলের অনুরোধে তাঁহারা দুইদিন রাবনিয়াতে

থাকিয়া বালাগ্রামে ফিরিয়াছিলেন। এইস্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাপজীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার কয়েক মাস পরেই চন্দ্রসিংহজী ধ্যানযোগে ব্রহ্মতালু ভেদ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছিলেন। নৌখা হইতে পদব্রজে এই যাত্রাকালে তাঁহারা বিভিন্ন গ্রাম পার হইয়া আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের ভিক্ষার দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে হইত। তারপর নিরাপদেই তাঁহারা বালা ফিরিয়া আসিলেন।

গজরাজজীর জীবনদান — গজরাজজীর জীবনদান বাপজীর প্রথম বিভূতির প্রকাশ। বালা গ্রামে চম্পালাল নামে একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর তিন পুত্র ছিল। বড় পুত্র গজরাজ, তাহার বয়স বাইশ বৎসর। মেজপুত্রের বয়স ছয় এবং সর্ব কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স ছিল তিন বৎসর।

মেজপুত্র একদিন প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হইয়া হঠাৎ দেহ ত্যাগ করিল। তাহার কয়েকদিন পরেই ছোট পুত্রটি এক বিচিত্র ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া বলিতে লাগিল, ''আমাকে ডাকিনী খাইতেছে, ১৫ দিনের মধ্যেই আমার মৃত্যু হইবে। তখন আমি মেজ ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হইব।'' তাহার এই বাণী সত্যে পরিণত হইল। যথার্থই সে ১৫ দিনের দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইল। পর পর এই রকম আকস্মিক শোকে পিতামাতা শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

ইহার কিছুদিন পরে গজরাজজী তাহাদের ব্যবসার কর্ম উপলক্ষ্যে 'পিপার সিটি' নামক স্থানে গিয়াছিলেন। সেই স্থানে চুল ছাঁটিয়া আসিবার পথে একটি পুকুরপাড়ে বৃক্ষের নীচে শীতল ছায়ায় বিশ্রাম লইয়াছিলেন। সেই সময় এক প্রেতাত্মা তাহার শরীরে প্রবেশ করে। তিনি ফিরিয়া আসিলে তাহার আচরণে অসঙ্গতি লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি তখন পাগলের মত কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। তখন বড় বড় ডাক্তার দেখানো হইল। কিন্তু কোন সুরাহা হইল না। এই সময় একজন ফকির তথায় আসিয়া গজরাজের সব লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন যে, ''উহাকে ভূতে ধরিয়াছে। যদি অনুমতি দেন তো আমি ভূত ছাড়াইতে পারি।'' তারপর তিনি ধূপ জ্বালাইয়া অনেক মন্তর-তন্তর পড়িতে লাগিলেন। তখন গজরাজের শরীরে প্রচণ্ড ঘাম হইতে লাগিল। একটু পরেই সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। ফকির একটি বোতল দেখাইয়া বলিলেন, ''ও-কে এখন ঘুমাইতে দিন, এই বোতলে আমি ভূতকে পুরিয়া রাখিয়াছি। ও এখন সুস্থ হইয়া যাইবে।'' কিন্তু তাহার পরে গজরাজের প্রচণ্ড জ্বর আসিল। সেইসঙ্গে প্রচণ্ড ঘাম হইতে লাগিল। সকলে যখন শীতের প্রাবল্যে কম্পমান, গজরাজ বলিলেন, ''আমার অত্যন্ত গরম লাগিতেছে।'' তাহার শরীরে ঘামও নির্গত হইতে লাগিল। তখন অগত্যা তাহার মাতা তাহাকে ছাতে লইয়া গেলেন। কিন্তু সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠিবার পূর্বেই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন তাহার মাতার শরীরের উপর। মাতা তাহার ধাক্কায় পড়িয়া গিয়া আহত হইলেন, তথাপি তিনি পুত্রের কুশল জানিতে চাহিলেন। কিন্তু পুত্রের কোনরূপ সাড়া না পাইয়া ধীরে ধীরে তিনি পুত্রের নিকট অগ্রসর হইয়া দেখিলেন পুত্রের স্পন্দনহীন হিমশীতল শরীর। তাহার আর্তনাদে সকলেই আসিয়া দেখিলেন গজরাজ দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। কান্নার শোর-গোল উঠিল। সময়টি ছিল মধ্যরাত্রি। পিতাও শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এইদিকে বাপজী তখন নৌখা গ্রামে গুরু গোলাপদাসজী মহারাজের ঝুপড়ির নিকটবর্তী একটি ঝুপড়িতে থাকিতেন। তাঁহাদের নিকটবর্তী আর একটি ঝুপড়িতে থাকিতেন সাধক ভুরোজী। বাপজী নিঃশব্দে আসিয়া ভুরোজীকে ধীরে ধীরে ডাকিয়া তুলিলেন এবং বলিলেন, ''এখনই তোমাকে বালা গ্রামে যাইতে হইবে। সেখানে গজরাজজীর মৃত্যু হইয়াছে। তুমি সেখানে প্রত্যুষের পূর্বে পৌঁছিয়া বলিবে, মৃতদেহ যেন বেলা ১১ টার পূর্বে দাহ না করা হয়। ওরা সূর্য্যোদয় হইলেই দেহে অগ্নিসংস্কার করিতে চেষ্টা করিবে।''

ভুরোজী বলিলেন, ''বালা গ্রাম হইতে আমি তো কাকিসার সহিত ট্রেনযোগে আসিয়াছি, এখন আমি রাস্তা চিনিয়া যাইতে পারিব না।'' তখন বাপজী বলিলেন, ''চল, আমি তোমাকে রাস্তা চিনাইয়া দিতেছি।'' এই কথা বলিয়াই তিনি দ্রুত বেগে চলিতে লাগিলেন। ভুরোজী তাঁহার পশ্চাতে ছুটিতে লাগিলেন। কিছুদূর ছুটিয়াই তিনি অত্যন্ত পিপাসার্ত হইয়া পড়িলেন। বাপজীকে তিনি বলিলেন, ''জল পান না করিয়া আর যে আমি থাকিতে পারিতেছিনা।'' দেখা গেল নিকটেই একটা কুঁয়ো ছিল কিন্তু সেখানে জল তুলিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বাপজী তখন তাহাকে বলিলেন, ''তোমার শিরস্ত্রান বস্ত্র জলে ভিজাইয়া তাহা নিঙড়াইয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই মুখে দাও।'' ভুরোজী তখন তাহাই করিলেন এবং সেই স্থানেই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তারপর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে তিনি বলিলেন, ''এইবার আমি কোন পথে যাইব?'' বাপজী তাহার সম্মুখে একটা কাঁচা রাস্তা দেখাইয়া বলিলেন, ''ঐ যে কাঁচা রাস্তাটা দেখা যাইতেছে, উহা বালা গ্রাম অবধি গিয়াছে। ঐ রাস্তা ধরিয়া তুমি শীঘ্র বালা গ্রামে যাও, সূর্য্যোদয়ের পূর্বে তোমাকে পৌঁছাইতেই হইবে নতুবা বাড়ীর লোকেরা দিবা

হইলেই তাহাকে দাহ করিয়া দিবে।'' ভুরোজী ভাবিয়া অবাক হইয়া গেলেন যে, নৌখা হইতে বালাগ্রামের কমপক্ষে ৫০ কি. মি. দূরত্ব, তিনি কেমন করিয়া এত দ্রুত এই স্থলে আসিলেন। বাপজী তাহাকে এই কথা বলিয়াই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। এই রহস্য ভুরোজীর মনে চিরদিনই রহিয়া গেল।

ভুরোজী সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই বালাগ্রামে আসিয়া চম্পালালজীকে বলিলেন, ''বাপজী নির্দেশ দিয়াছেন যে, বেলা ১১টার পূর্বে যেন গজরাজের দেহ দাহ করা না হয়।'' চম্পালাল ছিলেন বাপজীর ভক্ত। তিনি স্থির করিলেন বাপজীর নির্দেশ তিনি অবশ্যই মানিবেন। কিন্তু তাহার বড় ভ্রাতা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরা চাপ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন যাহাতে সূর্য্যোদয় হইলেই দেহ দাহ করা হয়, কারণ তাহা না হইলে পরিবারে অমঙ্গল হইবে। কিন্তু বাপজীর প্রতি পরম বিশ্বাসী চম্পালাল সকলের কথা অগ্রাহ্য করিয়া ,মৃতদেহ সাদা কাপড়ে ঢাকিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বেলা যখন সাড়ে দশটা তখন দেখা গেল গজরাজের শরীর হইতে প্রচুর ঘাম নির্গত হইতে লাগিল এবং একটু পরে গায়ের চাদর সরাইয়া দিয়া গজরাজ উঠিয়া বসিলেন। সম্মুখে দণ্ডায়মান ভুরোজীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, ''রাম রাম ভুরোজী।'' উপস্থিত লোকজনেরা তো এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। চম্পালাল এবং তাহার স্ত্রী তাহাদের একমাত্র পুত্রের জীবনদান করার জন্য বাপজীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আনন্দাশ্রু পাত করিতে লাগিলেন। *...ক্রমশঃ*

—মাতৃচরণাশ্রিতা শ্রীমতী বীণা চৌধুরী

নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(৩০)

রামকৃষ্ণদেব - ''তাইতো, তুই আজ এক ভাবনায় ফেলে দিলি, দেখি মাকে জিজ্ঞাসা করে, মাঝে মাঝে এমন এক বিদ্‌ঘুটে কথা জিজ্ঞাসা করিস্ যে, আমিতো কিছুই বুঝতে পারি না আর তখনই মাকে বলি, তুমি এমন বই না-পড়া ছেলেকে আপন করে নিলে কেমন করে? এ জগতের মা বাপেরা লেখাপড়াহীন ছেলেদের সর্বদা দূরছাই করে আবার জগৎমাতার কাছে তার উল্টোপাল্টা দেখি, মায়ের লীলাখেলা সবই বিদ্‌ঘুটে। ঐ শোন নরেন, মা বলছে তোর প্রশ্নের উত্তর উপনিষদে লেখা আছে— সৃষ্টি, সৃষ্টবস্তু ও সৃষ্টিকর্ত্তা সবই ব্রহ্ম বা বিশ্বপ্রকৃতি। এই বিশ্বপ্রকৃতিরই এক নাম দেওয়া হয়েছে ভগবান। অসীমকে সীমার মাঝে আনা বা তার নামকরণ করা গণ্ডী আবদ্ধ সাধকগণ দ্বারাই হয়ে থাকে। অসীমকে একটা ছবির মধ্যে এনে তার পুজো করা কেবল ডিঙাযোগে সমুদ্র পার হওয়ার মতই পাগলামি—তার উত্তরে মা কী বলছে জানিস্? এক একটা বিন্দুর মিলনেই যখন অনন্ত মহাসাগর বা অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতি তবে সেই বিন্দুর পূজা করলেইতো মহাবিন্দুর খবর পাওয়া যাবে। মানুষ যদি তার একটা ক্ষুদ্র চক্ষুমণির সাহায্যে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি ছড়াতে পারে আবার সেই ক্ষুদ্র চক্ষুমণি দিয়ে দূরবীন সাহায্যে গ্রহ রাশিকেও দেখতে পায় তাহলে, দেবতার দেওয়া দূরবীক্ষণ পেলে সেই অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখতে পাবে না কেন?''

বিবেকানন্দ খানিক স্তব্ধ হয়ে বসে কেবল রামকৃষ্ণদেবের কথা আবার ভাবতে ভাবতে একেবারে তন্ময় হয়ে শুধু রামকৃষ্ণদেবের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন; চোখে পলক পড়ে না, শুধু বিন্দু বিন্দু জল, তা টল্‌মল্ করতে লাগল। আধোঘুম ঘোরে আচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি দেখতে লাগলেন —মা ভবতারিণী যেন রামকৃষ্ণদেবের পাশে বসে, তাঁরই দিকে তকিয়ে বলছেন—'তোর সখা শ্রীদামকে বলিস্ আর দোরে দোরে ভিক্ষা করে কী হবে? তোরই দোরে ভিক্ষা করলেই, সব রকম দরদস্তুর বোঝা হবে, সব দোর-ই তার কেনা হয়ে যাবে, আর কত পরীক্ষা করবে তোকে? এবার নিজেকে পরীক্ষা দিতে বল'—

রামকৃষ্ণদেব সজল চোখে উত্তর দিতে লাগলেন, 'আমিও তোমায় অনেক পরীক্ষা করেছি মা, এমন কি নিজের চোখ উপড়ে ফেলে তোমার চরণেই ফেলতে চেয়েছিলুম, সেই অবস্থায় তুমি যদি আমার ডান হাতটি না ধরতে তাহলে হয়তো আমায় চির অন্ধ হয়েই থাকতে হত; মা, তোমার লীলা খেলা কে বুঝবে? পাষাণ মূর্তি থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সাথেই কথা কইছো তা চাক্ষুষ দেখে শুনেও যদি আমার অবস্থা এমনি হয়, তাহলে ওরা মানুষকে দেবতা ঠাউরাবে কেমন করে?' *...ক্রমশঃ*

শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম বদ্রীনাথধাম ভ্রমণ কথা

(৪)

ইং ২০০৯ সালে এলাহাবাদের প্রয়াগক্ষেত্রের যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত অরেল-এ সাচ্চাবাবার আশ্রমের মহান্ত শ্রীগোপালজীর সাথে তাঁদের হৃষীকেশের আশ্রমের মহান্তজী আমাদের আশ্রমে প্রথমবার পদার্পণ করেছিলেন। এখানে এসে আশ্রম ঘুরে দেখা, গুরুমহারাজগণের প্রতিষ্ঠিত আসন দর্শন করা, শ্রীশ্রীমার সাক্ষাতে সৎসঙ্গ ও সেবাগ্রহণ পর্ব শেষ হলে, তাঁরা এখান থেকে রওনা হওয়ার সময় শ্রীশ্রীমাকে তাঁদের দুই আশ্রমে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে যান। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের গুরুমার ইচ্ছা ছিল এবারে হৃষীকেশ ভ্রমণপথে তাঁদের আশ্রমে একবার যাবার। প্রথমবার চিনতে একটু অসুবিধা হলেও সঠিক পথ ধরে পৌঁছে যাই আমরা শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে সাচ্চাবাবার আশ্রমে। সেখানে উপস্থিত হয়ে আশ্রমের মহান্ত পরমহংসজীর খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারি, তিনি বেশ কিছুদিন পূর্বেই দেহ রেখেছেন। এই সংবাদটি আমাদের জানা ছিল না তাই, সেখানের শিষ্য-ভক্তজনেদের সাথে আমরা কয়েকজন ভিতরে গিয়ে তাঁর বেদীতে প্রণাম জানিয়ে সেখানের আরও একটি ঘরের মধ্যে পূর্বের মহান্তজীর বেদীতেও প্রণাম জানাই ও প্রসাদ পেয়ে ফিরে আসি। শ্রীশ্রীমা গাড়ীতেই ছিলেন এক গুরুভাইয়ের সাথে কারণ, একে তো মহান্ত পরমহংসজী নেই তার উপর কিছুক্ষণ পূর্বেই প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় আশ্রম চত্তরে জল জমে ছিল বলে। তাঁদের একটি আশ্রম বৃন্দাবন বিহারীর চরণছোঁয়া পুণ্যতোয়া নদী প্রয়াগের যমুনার তীরে, অপরটির এবারে দর্শন হয়েছিল যা গঙ্গোত্রী হিমবাহের কেন্দ্রস্থল দ্বারা সৃষ্টি, গোমুখের উৎস হতে প্রবাহিত হয়ে আসা অতি পুণ্যসলিলা পবিত্র নদী গঙ্গার তীরে অবস্থিত। এই আশ্রমটির পরিবেশখানি অতি মনোরম, তৈরীও বেশীদিনের পুরাতন নয় কিন্তু, সেখানে সেরকম কোন উচ্চ আধার সম্পন্ন সাধু-সন্তের সন্ধান আমরা পাইনি। তৈরী করা বড় ধরণের আশ্রম তপোস্থলী হৃষীকেশে থাকলেও ভাবছিলাম প্রকৃত সাধনা যেন সত্যই কোথাও হারিয়ে গিয়েছে। সেবামূলক কর্ম, শিক্ষা ব্যবস্থা, ধর্ম প্রচার থাকলেও সাধু-সন্তদেরও মধ্যে প্রকৃত সাধনার প্রয়োজন ও আগ্রহ থাকা উচিত অতি অবশ্যই। তা আমাদের কারো নজরে পড়েনি সেখানে। আমাদের মুখে শ্রীশ্রীমায়ের পরিচয় জানার পর সেখান থেকে ফেরার সময় কয়েকজন আশ্রমস্থ শিষ্য ভক্তজনেরা গাড়ীর কাছে এসে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম জানিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে যান। আর সেখানে দেরী না করে আমরা গাড়ী নিয়ে রওনা দিয়েছিলাম ‘রামকৃপালু মহারাজজীর’ আশ্রমের প্রতি।

ভরত মিলাপ আশ্রমে শ্রীরামকৃপালু মহারাজজীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমা

বিশেষ আমন্ত্রণে আমন্ত্রিত হয়ে রামকৃপালুজী আমাদের আশ্রমে গুরুমহারাজগণের জন্য তৈরী আসনে, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন ইং ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে। সেই সময় তিনি শ্রীশ্রীমাকে তাঁর হৃষীকেশের আশ্রমে পদার্পণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে যান। সেই বছরেই শ্রীশ্রীমা আমাদেরকে নিয়ে তাঁর আশ্রমে এসেছিলেন। এরপর আবার আমরা উপস্থিত হই মাতৃসঙ্গে বদ্রীনাথধাম যাত্রার পূর্বের দিন তাঁর ‘ভরত মিলাপ’ আশ্রমে। এটিও গঙ্গা নদীর তীরে গা-লাগোয়া তিনতলা বিশিষ্ট আশ্রম। যাত্রাপথে ফোনে শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতির কথা শুনে মহারাজজী পথেই দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্রীশ্রীমাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্যে। তিনি গুরুমাকে নিয়ে গিয়ে আশ্রমের ভিতরে আসনে বসান। আমরা সকলে মহারাজজীকে প্রণাম জানাই। পূর্বে যে সময় আমরা শ্রীশ্রীমায়ের সাথে তাঁর আশ্রমে এসেছিলাম, সেই সময় তিনি আমাদের গুরুমার (শ্রীশ্রীমার) নিকট হতে ক্রিয়াযোগদীক্ষা পেয়েছিলেন, সাথে তাঁর একজন বিদেশী শিষ্যকেও (দেবরামজী) শ্রীশ্রীমা যোগদীক্ষা প্রদান করেছিলেন। সেই আশ্রমের পূর্ব পরিচিতা সাধ্বীজী এসে শ্রীশ্রীমাকে বরণ ও প্রণাম জানিয়ে ভিতরে চলে যান আমাদের জলখাবারের ব্যবস্থা করতে। আমাদের সকলেরই খিদে পেয়েছিল, তা মহারাজজীকে জানালে তিনিও

সাধ্বীজীকে তাড়াতাড়ি করে তৈরীর ব্যবস্থা নিতে বলেন। এই সাধ্বীজীর সন্ন্যাসগ্রহণ মহারাজের নিকট হতে হয়েছে তা এবারে গিয়ে জানতে পারি। আশ্রমের কয়েকজন ও আমাদের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে শুরু হয়ে যায় সৎসঙ্গ। বিভিন্ন ধরণের আধ্যাত্মিক আলোচনা, সাধু-সন্তদের খবরাখবর, হিমালয়ের আবহাওয়া ও পথ-ঘাটের পরিস্থিতি, সেখানের আশ্রমের সংবাদ, মহারাজের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের কথা, এর সাথে শ্রীশ্রীমার শ্রীশ্রীবদ্রীনাথধামে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্যও সৎসঙ্গে অলোচিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের জিজ্ঞাসার মধ্যে ছিল জাগেশ্বরের ১২০ বছরের মহাত্মা শ্রীপ্রকাশানন্দজীর শারীরিক ও সমস্ত ধরণের কুশলের কথা। তারই প্রতিউত্তরে মহারাজজী শ্রীশ্রীমাকে জানান, ''মহাত্মাজীতো সেখানেই অর্থাৎ জাগেশ্বরের মোক্ষধামেই আছেন কিন্তু, মা এখন সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না, পথের অবস্থা বড়ই খারাপ আমি খবর পেয়েছি। বদ্রীনাথের পথের অবস্থাও ভালো নয়। যেহেতু তুমি নিজে যাচ্ছো, সেহেতু আমার বলার এখানে কিছু নেই।'' তিনি তো তাঁর গঙ্গার তীরের আশ্রমে আমাদের থাকার ব্যবস্থা প্রায় করেই ফেলেছিলেন। তখন আমাদের কাছ থেকে হরিদ্বারে হরিদাসধামের ধর্মশালার সব রকম ব্যবস্থার কথা শুনে, শান্ত হয়ে, বদ্রীনাথধাম থেকে ফেরার পথে তাঁর আশ্রমে রাত্রিবাসের জন্য শ্রীশ্রীমাকে জানান। তখন শ্রীশ্রীমা তাঁকে জানান, ''আগে তো বদ্রীনাথ থেকে মূল উদ্দেশ্য সাধন করে আসি, তারপর জানাবো।'' আমরা খিদের মুখে মহারাজজীর ব্যবস্থা করা খাবার আনন্দ করে খেয়ে ও আশ্রমের নতুন তৈরী করা তিনতলা দর্শন এবং গঙ্গা নদীর তীরে এসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যগুলি দেখতে থাকি। শ্রীশ্রীমা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক দেখতে থাকেন মহারাজজীর ও আমাদের সঙ্গে। গঙ্গা নদীর গা-লাগোয়া পাহাড়ের মনোরম শোভা ও স্রোতস্বিনী গঙ্গার তাল মিলিয়ে চলা ঢেউগুলির অপূর্ব দৃশ্য যেন সত্যই মনহরণকারী। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা আগত প্রায়, আবার আশ্রমের প্রার্থনা, ধ্যান ও জপের সময় এগিয়ে আসার ফলে, শ্রীশ্রীমা আমাদের নিয়ে চলে আসেন রামকৃপালুজীর আশ্রম থেকে হরিদ্বারের সচ্চিদানন্দজী ও গীতা ভাবীর বাড়ীতে। সেখানে বসে কিছুক্ষণ থেকে হাল্‌কা কিছু খাবার হাতে নিয়ে ফিরে আসি হরিদাসধামে। পরদিন ছিল আমাদের শ্রীশ্রীমার সাথে বদ্রীনাথধামে যাত্রার কথা। *...ক্রমশঃ*

—মাতৃচরণাশ্রিত স্বামী সংবেদানন্দজী

যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

প্রশ্ন ৩৮ : শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য কি?

উত্তর : আমাদের এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই হইল 'লিঙ্গ-জ্যোতি' স্বরূপ। বিন্দুরূপী শিব হইতে দুটি জ্যোতির ধারা, একটি পুরুষভাব এবং অপরটি প্রকৃতি-শক্তিরূপা স্ত্রীভাব, নির্গত হইয়া সমগ্র সৃষ্টিকে আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থান করিতেছে। এইটিকেই 'লিঙ্গজ্যোতি' বলে। শিবলিঙ্গ সৃষ্টির প্রতীক শিব ও শক্তির সমরস্যভাবকে বুঝায়। দুই প্রকার 'লিঙ্গ' দেখিতে পাওয়া যায় —(১) শিবলিঙ্গ, (২) বিষ্ণুলিঙ্গ বা শালগ্রাম শিলা। এই উভয় প্রকার লিঙ্গকেই 'ব্রহ্মলিঙ্গ' বলা হইয়া থাকে। অতএব শিবলিঙ্গ ও বিষ্ণুলিঙ্গ উভয়ই পরমব্রহ্মের প্রতীক স্বরূপ। ''আলয়ং লিঙ্গমিত্যাহুর্ণলিঙ্গং লিঙ্গমুচ্যতে। যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি লীয়ন্তে বুদ্বুদা ইব।।'' — অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় বিশেষকে লিঙ্গ বলে না, আলয়কে লিঙ্গ বলিয়া জানিবে। আলয় অর্থাৎ সর্বভূত যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়। সমুদ্রে যেমন সমুদ্রোত্থিত বুদ্বুদ লয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শিব হইতে উদ্ভুত বুদ্বুদ স্বরূপ জীব সমুদয় যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই 'লিঙ্গ' (শিব বা বিষ্ণুলিঙ্গ)। গুরুগীতায়

আছে ''অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষঃ'', সেটিই হইল লিঙ্গশরীর। লিঙ্গশরীর অর্থে ব্রহ্মদেহ, যা হইল অস্তিত্ববোধক দেহ। লিঙ্গ শরীরের মধ্যেই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ, শাক্ত দেহগুলি অবস্থান করে। পরম পুরুষ শিব সর্বময় হইলেও তিনি যোগীসাধকের হৃদয় মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানেই অবস্থান করেন এবং তাই তিনি 'লিঙ্গ' আর সেই লিঙ্গেরই উপাসনা যোগ সাধনায় করা হইয়া থাকে।

শিবলিঙ্গ পূজা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা। শিবলিঙ্গের আকৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্নে রহিয়াছে প্রায় গোলাকৃতি একটি সমতল আর সেই সমতলের উপরে রহিয়াছে লম্বা গোলাকৃতি শীর্ষযুক্ত একটি স্তম্ভ। এই স্তম্ভটিকে

বলা হয় শিবলিঙ্গ এবং নিম্নের গোলাকৃতি আধারটিকে বলা হয় গৌরীপীঠ। আকাশ লিঙ্গ এবং পৃথিবী হইল তাঁহার আসন; মহাপ্রলয়ের সময় সকল দেবগণের লয় হইয়া একমাত্র লিঙ্গরূপী শিবই বর্তমান ছিলেন, তাই তিনি 'লিঙ্গ' শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। অনন্ত ঈশ্বর ও তৎসূক্ষ্মা মূলা প্রকৃতিকে সহজে ধ্যান-ধারণার মধ্যে আনা সম্ভব হয় না। তাই অধিকারভেদে এই লিঙ্গরূপী শিবের ও শিবশক্তি পরমেশ্বরী কালিকা দেবীর আরাধনা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন মুনিঋষিগণ। শিবলিঙ্গ হইল আদিদেবের অর্দ্ধনারীশ্বর বিগ্রহের মূর্ত প্রতীক যাহা প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি এই দুই মার্গকেই চিহ্নিত করে। সেইকারণে শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য অপরিসীম। ইহা ভিন্ন শিবলিঙ্গের উপাসনা প্রকৃতপক্ষে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের পূর্ণব্রহ্মের উপাসনা। শিবলিঙ্গের উপাসনার মধ্য দিয়া সকল দেবদেবীর উপাসনা সিদ্ধ হয়। তাই ইহা উপাসনার একটি উৎকৃষ্ট প্রতীক।

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব

চতুর্বিংশ পর্য্যায়—

শ্লোক :— *সৌম্যা সৌম্যতরা শেষ সৌমেভ্যস্বতি সুন্দরী।*
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী।।৬০

বাংলা শ্লোকার্থ :— মা! তুমি একাধারে সৌম্যা, সৌম্যতরা এবং সৌম্যতমা। অতিশয় তোমার সৌন্দর্য্য। তুমি পর ও অপর উভয়ের আশ্রয়, তাই পরমেশ্বরী।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— যোগ সাধনার উন্নতির সাথে যে আত্মিক জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাতে যোগী জগৎমাতাকে সৌম্যারূপে অবলোকন করে আত্মস্থ হন। উত্তরোত্তর সাধনায় চেতনার অগ্রগতির সাথে জগন্মাতার সৌম্যতরা অদ্ভুত চিন্ময়ী রূপ যোগীর প্রাণমন স্পর্শ করে তাকে অভিভূত করে। ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র সৌন্দর্য্যরাশি কল্পনায় একত্রিত করলে যে সৌন্দর্য্য বোধের উদয় হতে পারে, তাই-ই মায়ের সৌম্যতমা মূর্তির আভাস।

এইরূপে যোগীর মন, প্রাণ ও বুদ্ধি মাতৃভাব ও সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে পূর্ণ সমাহিত হলে পরাপর ভাবের আরাধ্যা জগতজননী পরমেশ্বরী রূপে যোগীর অন্তরাকাশে আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে দিব্য আনন্দে আত্মহারা করেন।

শ্লোক :— *যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।*
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা।।৬১

বাংলা শ্লোকার্থ :— হে বিশ্বস্বরূপিণী! জগতে সৎ অসৎ যা কিছু বস্তু আছে এবং জগৎ ব্যাপী যে শক্তি তা সব কিছুই যখন তুমি, তখন কি ভাবে তোমার স্তব করব?

যৌগিক ব্যাখ্যা :— জগতজননী একদিকে পরমা পরমেশ্বরী রূপে দুরধিগম্যা; অন্যদিকে বিশ্বস্বরূপিণী বলে সকল শক্তির উৎসই তিনি এবং সকলের উপলব্ধি যোগ্যা। ভেদ-জ্ঞানের ফলে মানুষের মনে সৎ-অসৎ প্রকৃতির জন্ম। কিন্তু উভয় প্রকৃতিই বিশ্বমাতার বিবিধ রূপ। মাতৃশক্তির এই সর্ব্বতোমুখী একক প্রভাব ও বহুত্ব অনুভব করে যোগী শুধু দিশাহারাই নয়, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। দ্বৈতবোধে মাতৃ আরাধনা করতে গিয়ে তিনি যখন অতীন্দ্রিয় স্তরে উন্নীত হন, তখন বহুত্বহীন চেতনায় আরোহণ করেন। শুধু অস্তিবোধ স্বরূপ এই স্তরে পূজ্য-পূজকের প্রভেদ থাকে না বলে কোন স্তব অর্চ্চনা সম্ভব নয়।

শ্লোক :— *যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।*
সোহপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ।।৬২

বাংলা শ্লোকার্থ :— স্বয়ং বিষ্ণু যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা। তিনিই যখন তোমার প্রভাবে যোগনিদ্রামগ্ন, তখন কে তোমার স্তব করবে?

যৌগিক ব্যাখ্যা :— জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের আধার স্বরূপ প্রাণ বা বিষ্ণুশক্তি মাতৃ আবেশে যোগনিদ্রা মগ্ন হলে জগতব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে উদাসীন থাকেন। ব্রহ্মারূপী মন প্রাণশক্তিতেই শক্তিমান। তাই জগতবিষয়ে প্রাণের বিমুখতা হেতু মনের মাতৃ-স্তব রূপ কোন কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা থাকে না। ব্যষ্টি ক্ষেত্রেও সাধক মন সাধনার চরম স্তরে উন্নীত হলে তাঁর ব্যষ্টি মনপ্রাণ সমষ্টি মনপ্রাণ স্বরূপ মাতৃ অঙ্কে বিলীন হয়ে যায়। এই অবস্থায় কোন দ্বৈতবোধ প্রতীত হয় না। সাধক তখন উপাসনার এমন স্তরে উপনীত হন, যেখানে মাতৃ প্রভাব আত্মোপলব্ধি ও আত্মানুভূতিতে অবাঙ্মনসগোচর অবস্থায় তিনি আত্মহারা হন। সাধনার প্রাথমিক স্তরে সাধকের অন্তরে দ্বৈতবোধ থাকলেও সিদ্ধাবস্থায় অতীন্দ্রিয় স্তরে উন্নীত হলে অদ্বৈত বোধ প্রাপ্ত হয়।

...ক্রমশঃ

—অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায় (অবসরপ্রাপ্ত)
বহরমপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ

গীতা ভাবনা
(২৯)

গীতা সম্পর্কে যাঁরা ঐতিহাসিক কালপর্যায়ের আলোচনা করেছেন তাঁদের কারও কারও মতে গীতা মহাভারতের অংশ নয়। এটা মহাভারতের আগেই লেখা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। মহাভারতের রচয়িতা ঠিক সময়ে গীতাকে মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষেপ করেছেন। শ্রীঅরবিন্দও এরূপ কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ আবার বৌদ্ধোত্তর যুগে আশোকের পরে গীতা রচিত হয়েছিল বলে মনে করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা এই বিষয়ে এত আলোচনা করেছেন যে তা নিয়েই একটা পুস্তিকা হতে পারে। স্বামীজি কোনও সময়েই পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য তর্ক বিতর্ক পছন্দ করতেন না। তবুও এই বিতর্কে ভারতীয় পরম্পরার সঙ্গে তিনি একমত। 'রচনা ও বাণীর' ১ম খণ্ডে ১৬৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন — ''অনেকের ধারণা যে গীতা মহাভারতের যুগে লিখিত হয় নাই — পরবর্তীকালে মহাভারতের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল। ইহা ঠিক নয়। মহাভারতের প্রত্যেক অংশেই গীতার বিশেষ বাণীগুলি পরিলক্ষিত হয়।'' ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করলেও গীতার শাস্ত্রার্থ ম্লান হয়না বলে স্বামীজির বিশ্বাস ছিল।

গীতার পটভূমিতে আছে একটা বিশাল যুদ্ধ। যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বৈক্লব্যগ্রস্ত অর্জুন তীরধনুক ফেলে দিয়ে শোকোদ্বিগ্ন মনে রথের উপর বসে পড়লেন এবং যুদ্ধ করবেন না বলে কৃষ্ণকে জানিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ তখন কৃপার দ্বারা আবিষ্ট হলেও স্বধর্মবিরোধী অর্থাৎ রজঃগুণ বা ক্ষাত্রধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে তমোগুণ বিশিষ্ট হবার জন্য ধিক্কার দিয়েছেন অর্জুনকে —''ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'' বলে । গুরুর শাসনের মতোই এই ধিক্কারে তেজস্বীতা আছে। যে যুদ্ধের জন্য এত দিব্যাস্ত্র সংগ্রহ, এত সংযত ভঙ্গি, এত দৌত্য; সত্যি সত্যিই যখন সেই যুদ্ধ জীবনে এসে উপস্থিত হল তখন সেনাপতি অর্জুনের মধ্যে জেগেছে পলায়ন-পরায়ণতা। এযেন আমাদের মতো সমস্যার সামনে ভেঙে পড়ার মানসিকতা। কৃষ্ণ একে প্রতিহত করতে চেয়েছেন। আত্মতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে পরপর অধ্যায়গুলিতে অর্জুনের নানা প্রশ্নের সমাধানের মধ্যে শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহটাই প্রকাশিত।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন — গীতা কি সত্যিই যুদ্ধের উন্মাদনা জাগিয়েছে? গীতার পাঠকেরা জানেন যে প্রথম অধ্যায়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে যুদ্ধের আর কোনও প্রসঙ্গ নেই এমনকী শেষ অধ্যায়েও অর্জুনকে যুদ্ধ করার আদেশ কৃষ্ণ দিলেন না ''আমাকে স্মরণ করে যুদ্ধ কর'' ইত্যাদি উক্তি অন্তরের যুদ্ধের কথা। অষ্টাদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণ বললেন — 'অন্তর্যামী নারায়ণ সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে সর্বভূতকে মায়া যন্ত্রে বসিয়ে পুতুলের মতো ঘোরাচ্ছেন। সেই পরম কারণ তোমারই হৃদয়ে অবস্থিত। তাই তাঁর শরণাগত হতে হবে' (১৮/৬১)। জগতের যত পথ আছে সমস্ত পথগুলি বিমূঢ় শিষ্যের সামনে আদর্শ গুরুর মতো তুলে ধরেছেন কৃষ্ণ। 'গুহ্যাৎ গুহ্যতরং' জ্ঞান দিয়ে শিষ্যের চেতনাবোধ জাগ্রত করে অবশেষে বললেন - ''বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু'' (১৮/৬৩)। কাজেই গীতা পৃথিবীতে যুদ্ধের উন্মাদনা ছড়াবার জন্য লেখা হয়নি বরঞ্চ সংযত হতেই বলেছে।

ভারতীয় শাস্ত্র পড়ার সময় তার পরম্পরার ধারাটাকে না বুঝলে কিছু ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যায়। কোনও শাস্ত্রে বা কথার আলোচনা করতে গেলে তার উপযুক্ত একটা পটভূমি প্রস্তুত করে নিতে হয়, যাকে বলা হয় ভূমিকা। কুরুক্ষেত্রের পটভূমিও সেই ভূমিকার অংশ। প্রথম অধ্যায়ে ভগবানের কোনও উক্তি নেই। ভগবানের উক্তি আরম্ভ হল ভর্ৎসনা ও আত্মতত্ত্ব-কথন দিয়ে। মীমাংসকগণ ও উপনিষদের ভাষ্যকারগণ বলেছেন - 'শাস্ত্রে যখন কোনও আখ্যানের অবতারণা করা হয়, তার পিছনে উদ্দেশ্য হল তত্ত্বের অনায়াসজ্ঞান সাধন করা' — ''আখ্যায়িকাভাগঃ অনায়াসগ্রহণার্থঃ''। এই যুদ্ধের গল্পটা বাদ দিয়ে গীতা পড়লেও বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। গীতার ঐতিহাসিক পটভূমিকার ব্যাখ্যা স্বামীজি তাঁর শিষ্য শুদ্ধানন্দের কাছে করেছেন। গীতা তাঁর কাছে গবেষণার বিষয় নয় বলেই এসব আলোচনা 'এহ বাহ্য'। শুষ্ক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচারে বা তত্ত্ববোধের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বিচারে স্বামীজি কখনও অগ্রসর হননি।

...ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা

সপ্তবিংশপর্য্যায় — (ঊর্বশী)

পুরুরবা-ঊর্বশী সূক্তের পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সাঙ্কেতিকতার সাহায্যে এখানে যজ্ঞতত্ত্বও ব্যাখ্যাত হয়েছে। পূর্বোক্ত সূক্তের ৪র্থ মন্ত্রে পুরুরবার সঙ্গে ঊর্বশীর প্রতিদিন ৩ বার করে মিলনের যে আখ্যান আছে তা প্রকৃতপক্ষে প্রাতঃ সবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবনের রূপক। আকাশে সূর্যের অবস্থানভেদের ফলেই এরূপ সবনের কাল নির্ণয় করা হয়। এই সব কথার তাৎপর্য পরে আমরা বৈদিক আখ্যানে শ্লীলতা-অশ্লীলতার আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করব।

একথা ঠিক যে বিশেষ কোন যজ্ঞে (১০/৯৫) সূক্তটির বিনিয়োগ পাওয়া যায় না। তবুও সূক্তের শেষ মন্ত্রে যজ্ঞের কথা আছে এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে হোমের ফলে স্বর্গে গিয়ে আহ্লাদ পাবার কথাও আছে। পুরুরবা-ঊর্বশী সূক্তের পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় তার একটা বিশেষ সাঙ্কেতিক বক্তব্য ছিল যা একটা ট্রাজিক নাটকের আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

এই আখ্যান পরে পৌরাণিক সাহিত্যে একান্ত ভাবেই প্রেমের আখ্যানে পরিণতি লাভ করেছে তার সঙ্গে সাঙ্কেতিক অর্থের তেমন কোন সম্পর্ক পাওয়া যায় না। এই ব্যাপারটা যে কেবল এই আখ্যানের ক্ষেত্রেই ঘটেছে এমন নয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পৌরাণিক কবিরা বেদের খাঁটি দুধে জল মেশাতে গিয়ে জলকেই প্রধান করে তুলেছেন। 'ইতিহাসপুরাণাভ্যাম্ বেদং যমুপবৃংহয়েৎ' একথা সব পৌরাণিক আখ্যান সম্পর্কে তাই প্রযোজ্য নয়। তবে টীকাকারদের কল্যাণে অনেক বৈদিক তাৎপর্য্যার্থ পণ্ডিতেরা পুরাণ থেকেই আবিষ্কার করেছেন ঊর্ধমুখী ব্যাখ্যান পদ্ধতির ধারায়। বর্তমান প্রবন্ধে ঊর্বশী সম্পর্কে প্রচলিত আখ্যানগুলির দুই চারটি মাত্র তুলে ধরা হচ্ছে। যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের আখ্যানটি অনেকটাই পূর্ণ বলে এবং পৌরাণিক আখ্যানধারার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকার ফলে সেই আখ্যানটির প্রথম উল্লেখ করছি।

একদিন ইন্দ্রসভায় নৃত্যের সময় সেখানে উপস্থিত পুরুরবা যখন ঊর্বশীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন তখন ঊর্বশীর তালভঙ্গ হল। তাই ইন্দ্রের অভিশাপে ঊর্বশীকে মর্ত্যে আসতে হল। ঊর্বশীকে পুরুরবা কামনা করলে তিনি শর্ত করলেন - দিনে ৩ বার পুরুরবা ঊর্বশীকে আলিঙ্গন করতে পারবেন এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুরুরবা কোন কাজ করতে পারবেন না। পুরুরবাকে নগ্ন অবস্থায় দেখলে ঊর্বশী অন্তর্হিতা হবেন। এভাবে বহুবছর কাটাবার পর অপ্সরারা স্বর্গে যখন ঊর্বশীর অভাব অনুভব করতে থাকলেন তখন ঊর্বশীকে ফিরে পাবার জন্য পন্থা উদ্ভাবন করতে থাকলেন। একদিন রাত্রে ঊর্বশীর শয্যায় সঙ্গে বাঁধা থাকা মেষশাবক দুটির মধ্যে গন্ধর্বরা একটিকে চুরি করে নিয়ে যায়। ঊর্বশী নিদ্রিত পুরুরবাকে মেষশাবক উদ্ধারের জন্য জাগিয়ে তুললে নগ্নাবস্থাতেই পুরুরবা গন্ধর্বদের পিছনে ধাওয়া করলেন। তখনি তীব্র বজ্রালোকে ঊর্বশী পুরুরবার নগ্নরূপ দেখার ফলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণে ঊর্বশী অন্তর্হিতা হলেন।

ঊর্বশীকে পাবার জন্য দুঃখে পরিভ্রমণরত পুরুরবা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে পড়লেন। শেষকালে কুরুক্ষেত্রের কাছে জলাশয়ে হংসীরূপধারী অপ্সরাদের সঙ্গে হংসীরূপী ঊর্বশীকে খুঁজে পেলেন। পুরুরবা বার বার তাঁকে গৃহে ফেরার জন্য অনুরোধ করলেও ঊর্বশীর মন গলল না। শেষে বছরের শেষ রাত্রে একবার মাত্র ঊর্বশীর সঙ্গে রাজার মিলনের অনুমতি মিলল। প্রথম বৎসরে এভাবে ঊর্বশী আয়ুকে জন্ম দিলেন। এভাবে ক্রমশঃ ৫ টি মতান্তরে ৭ টি পুত্র রাজার ঔরসে ঊর্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করল। একদিন ঊর্বশী পুরুরবাকে জানালেন যে গন্ধর্বরা রাজাকে প্রার্থীত বর দিতে চান। তদনুসারে ঊর্বশীর সহবাস প্রার্থনা করলেন রাজা। গন্ধর্বরা তখন একটা প্রজ্জ্বলিত পাত্র এনে পুরুরবাকে দিয়ে বললেন - এই অগ্নি গ্রহণ করুন এবং বৈদিক বিধিতে একে তিনভাগ করুন তাহলেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। তারপর থেকেই ঊর্বশী ও পুরুরবা গন্ধর্বলোকে বাস করতে থাকলেন।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে ষষ্ঠ অধ্যায়ে পুরুরবা - ঊর্বশীর যে আখ্যান পাই সেখানে শতপথ ব্রাহ্মণের আখ্যানের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। যজ্ঞ ব্যবস্থার সঙ্গে এই আখ্যানের সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্ট। বুধ ও ইলার পুত্র পুরুরবাকে মর্ত্যে শাপভ্রষ্টা ঊর্বশী বরণ করেছিল তার শক্তিমত্তা ও সৌন্দর্যের জন্য। রাজা তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে ঊর্বশী অন্য উপাখ্যানের মতই রাজাকে দিয়ে শর্ত করান এবং শেষে অপহরণের ঘটনায় রাজার নগ্নরূপ দর্শনে অন্তর্হিতা হন। উন্মত্ত রাজা ঊর্বশীকে অন্বেষণ কালে কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী অম্ভোজ সরোবরে বারজন অপ্সরার সঙ্গে ঊর্বশীকে দেখে তাঁকে ফেরাবার জন্য আকুল আহ্বান জানালে ঊর্বশী তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং জানালেন — 'আমি এখন গর্ভবতী। এক বছর পরে আপনি

এখানে আসবেন সেই সময় আপনার একটি পুত্র হবে এবং একরাত্রি আপনার সঙ্গে সহবাস করব।' এভাবে প্রথমে আয়ু এবং পরে অন্য ৫ টি পুত্রকে গর্ভে ধারণ করলেন ঊর্বশী। গন্ধর্বরা রাজাকে ইচ্ছামত বর প্রার্থনা করতে বললে তিনি ঊর্বশীকেই চাইলেন। গন্ধর্বরা তখন তাঁকে একটি অগ্নিস্থালী দিয়ে বললেন — বৈদিক বিধি অনুসরণ করে ঊর্বশীর সহবাস কামনা করে প্রতিদিন তিনভাগ করে এই অগ্নির উপরে যজ্ঞ করবেন। তাহলেই ঈপ্সিত ফল পাবেন। এই তিনভাগ কি তিনবার করে হবন নয়? (গন্ধর্বা রাজ্ঞেহগ্নিস্থালীং দদুঃ। উচুশ্চ এনমগ্নিসম্পায়ানুসারী ভূত্বা, ত্রিধা কৃত্বা, ঊর্বশীসলোকতা মনোরথমুদ্দিশ্য সম্যগ্ যজেথাঃ। ততোহবশ্যমভিলষিতমবাপ্স্যসি)। রাজা সেই অগ্নিস্থালী নিয়ে নিজের রাজ্যের দিকে যাত্রা করলেন। পথে একটি বনের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর মনে ভাবনা এল - 'আমি মূর্খ বলেই অগ্নি স্থালীটা নিয়ে এলাম ঊর্বশীকে আনলাম না।' এরূপ চিন্তা করে বনেই সেই অগ্নিস্থালী ফেলে দিয়ে নগরে চলে এলেন। রাত্রে তিনি ভাবলেন গন্ধর্ব প্রদত্ত সেই স্থালীটা পরিত্যাগ করা ঠিক হয়নি অতএব তিনি আবার বনে গেলেন। যেখানে স্থালীটি পরিত্যাগ করেছিলেন সেখানে দেখলেন একটা বিশাল সমীগাছের উপরে অশ্বত্থ গাছ জন্মেছে। সেই অশ্বত্থকেই অগ্নিরূপে গ্রহণ করে বাড়ীতে ফিরে তা দিয়ে অরণী (যে কাঠ ঘষে যজ্ঞের অগ্নি উৎপন্ন করা হয়) প্রস্তুত করে গায়ত্রী মন্ত্রের ২৪ অক্ষর অনুসারে ২৪ অঙ্গুলিপরিমাণ অরণী প্রস্তুত করে বেদানুসারে তাতে হোম করতে থাকলেন। যজ্ঞের দ্বারাই ঊর্বশীর সঙ্গে গন্ধর্বলোকে তাঁর বাস হল। অরণীকে মন্থন দণ্ডের দ্বারা ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপাদন করাই বৈদিক বিধি, যাজ্ঞীক বিধান অনুসারে শুভ নক্ষত্রে জায়াপতি পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় অগ্নি উৎপাদন করে তাতে ৩ টি পবমানেষ্টি সম্পাদন করে। ঐ অগ্নিকে আহবনীয় গার্হপত্য ও দক্ষিনাগ্নি কুণ্ডে স্থাপন করা হয়। এই তিনটি অগ্নির কাজ ৩ প্রকার। দক্ষিণাগ্নিকে আজীবন অনির্বাণ ভাবে রক্ষা করতে হয় যজমানকে। বিষ্ণুপুরাণের আখ্যানে যজ্ঞের একটা বিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। আগে অগ্নি একটিই ছিল। এই মন্বন্তরে ইলার পুত্র পুরুরবা তিন প্রকার অগ্নি প্রস্তুত করলেন (একোহগ্নিরাজাভবৎ, ঐলেন ত্বত্র মন্বন্তরে ত্রেধা প্রবর্তিতা)। পুরুরবা ঊর্বশীর উপাখ্যানে যে যজ্ঞাগ্নি বিদ্যার রূপক একথা আখ্যানের নানা অংশেই পরিস্ফুট হয়েছে।

মহাভারতের ঊর্বশী আখ্যানে ইন্দ্রের সঙ্গে ঊর্বশীর যোগের কথা যেমন পাওয়া যায় তেমনি তার ভোগসর্বস্ব দৃষ্টির পরিচয়ও পাওয়া যায়। অর্জুন বনবাস-কালে ইন্দ্রলোকে গিয়েছিলেন নৃত্যগীতাদি শিক্ষার জন্য। তখন ঊর্বশী অর্জুনের সঙ্গ কামনা করলে অর্জুন তাকে মাতৃবৎ প্রণাম করেন। কারণ ঊর্বশী ও পুরুরবার পুত্র আয়ুর প্রপৌত্র ছিলেন তিনি যার থেকে পুরুবংশের উৎপত্তি। তাই ঊর্বশী মাতৃবৎ। ঊর্বশীর কাছে শিক্ষা নিয়ে তাকেই প্রত্যাখ্যান করায় ক্ষিপ্তা ঊর্বশী অর্জুনকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে সম্মানহীন নপুংসক নর্তক হয়ে স্ত্রীদের মধ্যে তাকে থাকতে হবে। অজ্ঞাতবাস কালে বিরাটরাজ্যে তাই বৃহন্নলা হয়ে অর্জুনকে কাল কাটাতে হয়।

পদ্মপুরাণে ঊর্বশীর উপাখ্যান অন্যভাবে কথিত হয়েছে — একদা বিষ্ণু ধর্মপুত্র হয়ে গন্ধমাদন পর্বতে তপস্যা করছিলেন। ইন্দ্র এই তপস্যায় ভীত হয়ে কয়েকজন অপ্সরার সঙ্গে বসন্ত ও কামদেবকে পাঠালেন তপোভঙ্গের জন্য। অপ্সরারা বিষ্ণুর তপোভঙ্গ করতে সমর্থ হবার পর কামদেব অপ্সরাদের ঊরু থেকে ঊর্বশীকে সৃষ্টি করলেন। ইন্দ্র ঊর্বশীর পারদর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে অপরূপা ঊর্বশীকে পেতে চাইলে ঊর্বশী সম্মতা হলেন। কিন্তু পরে মিত্র ও বরুণ ঊর্বশীকে পেতে চাইলে এবং ঊর্বশী তাদের প্রত্যাখ্যান করলে ঊর্বশী অভিশপ্তা হয়ে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে পুরুরবার স্ত্রী হন। বেদের মিত্রাবরুণের সঙ্গে ঊর্বশীর সম্পর্কের কথা এই আখ্যানে বলা হলেও শতপথ ব্রাহ্মণের আখ্যানের সঙ্গে এর পার্থক্য অনেক। বেদের তত্ত্বসমৃদ্ধ আখ্যান কিভাবে পুরাণের কবিদের হাতে ক্রমশঃ তাৎপর্য হারাচ্ছিল তা অন্য আখ্যান পর্য্যালোচনা করলে যেমন জানা যাবে তেমনি এই আখ্যানটি আলোচনা করলেও জানা যাবে।

পুরুরবা-ঊর্বশীর আখ্যান মহাকবি কালীদাসকেও প্রভাবিত করেছিল বলে তিনি 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকে আখ্যানটির নবরূপ দিয়েছেন। সেখানে দেখি কেশী নামক দৈত্য ঊর্বশীকে হরণ করে নিয়ে যাবার সময় রাজা পুরুরবা ঊর্বশীকে উদ্ধার করেন। ক্রমশঃ পুরুরবা ও ঊর্বশী প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন। ঊর্বশী পরে তার স্বস্থান স্বর্গলোকে চলে গেলেও অন্তরের গভীরে পুরুরবার প্রতি প্রেম অক্ষুন্ন ছিল। স্বর্গে নাট্যাভিনয়ের সময় ডায়লগে পুরন্দরের নামের বদলে মর্ত্যের নায়ক পুরুরবার নাম উচ্চারণ করে ফেললেন ঊর্বশী। এতে শাপগ্রস্ত হলে তিনি মর্ত্যে এলেন এবং পুরুরবার স্ত্রী হলেন। পুত্রের মুখদর্শন করার পরে ঊর্বশীর শাপমোচন হল। পরে নারদের বরে পুরুরবা-ঊর্বশীর শাশ্বত মিলন ঘটে।

...ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনাভাস

মহাবতার বাবাজী মহারাজের শিষ্য শ্রীমাণিকলাল দত্তের জীবনী

(১)

পিতামহের চুঁচুড়া আগমন—

গুরুকৃপায় যে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মহাজীবন, তাঁহার গুরুদীক্ষা, সাধন বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করিতে ব্রতী হইয়াছি তাঁহার বংশ-পরিচয়ের বৃত্তান্ত সর্ব প্রথমে পাঠক ও অনুরাগীবৃন্দের নিকট নিবেদন করিবার বাসনা পোষণ করি। দৈবযুক্ত পুরুষের বংশ পরিচয় ও আবির্ভাব যে দৈবসম্ভূত তাহা দৈবযুক্ত ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

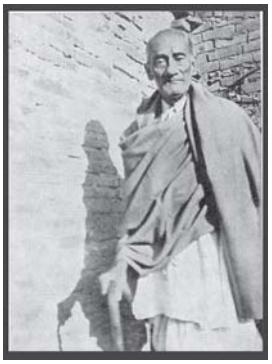

শ্রীমাণিকলাল দত্ত

মাণিকলাল দত্ত মহাশয়ের পিতামহ স্বর্গীয় কালীচরণ দত্ত, যিনি পরবর্ত্তী জীবনে কালীমুক্তাওয়ালা নামেই বিশদভাবে পরিচিত হন, পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। বাল্যকালেই তিনি পিতৃহীন হইয়া জ্ঞাতি শত্রুভয়ে জননীর আশ্রয়ে, আদি নিবাস, তথা পিতৃভূমি মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া, চুঁচুড়ায় আগমন করিলেন। চুঁচুড়া চৌমাথা নিবাসী ৺সাগর দত্তের বংশধরগণের অভয় বাণী ও সর্বপ্রকার সাহায্যের উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করিয়া কালীচরণের বিধবা জননী কামার পাড়া বাজারে (বর্তমান যে গৃহে ডাঃ পরেশচন্দ্রদে'র ক্লিনিক্যাল লেবরেটারী) বসবাস শুরু করিলেন। কালক্রমে কালীচরণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি স্বভাবসিদ্ধভাবে অনুরাগ বশতঃ জীবিকা অর্জনের জন্য মহানগরী কলিকাতার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে যাত্রা করিতে হইল। আধুনিক কালের মত সেইকালে চুঁচুড়ার সহিত রেলপথে কলিকাতার কোন সংযোগ না থাকায় গঙ্গা বক্ষে জলপথে মহানগরীতে আগমন করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। কলিকাতায় ভাগ্যান্বেষণের পথিক হিসাবে রাজা বদ্রীদাসের সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল। বদ্রীদাস সুদূর স্বদেশ ত্যাগ করিয়া জীবিকার্জনের জন্য সেই সময় কলিকাতায় আসিয়া ছিলেন এবং সততা ও নিষ্ঠার দ্বারা ভাগ্যলক্ষ্মীকে সুপ্রসন্ন করিয়া পরবর্ত্তী জীবনে প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হইয়া রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। কালীচরণ বদ্রীদাসের সংস্পর্শে আসিবার পর হইতে তাঁহারই সহিত মুক্তার ব্যবসায় লিপ্ত হইলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য ভাবে তাঁহার অর্থোপার্জন ঘটিতে থাকে। এমনিভাবে কালীচরণ বদ্রীদাসের একান্ত প্রিয়ভাজন ও ভালবাসার পাত্ররূপে পরিণত হইলেন। সেই সূত্রে কালীচরণের পৌত্র মাণিকলালের জীবনের যেটুকু অধ্যায় ব্যবসার সহিত যুক্ত ছিল তাহা বদ্রীদাসের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিতেছি যে মুক্তা সংক্রান্ত ব্যবসা সম্পর্কে কালীচরণ যে মাত্র স্বদেশের রাজা মহারাজা ও ধনী শ্রেণীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাই নহে ইংল্যাণ্ডের কয়েকটি অভিজাত পরিবারবর্গের সহিতও এই ব্যবসা সূত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল ইহার কিছু প্রমাণপত্র আজও হস্তগত আছে।

ইছামতী নদীতে তৎকালে প্রভূত পরিমাণে মুক্তা জন্মাইত। এই জাতীয় মুক্তা সংগ্রহের সামগ্রিক ভার ছিল কালীচরণের উপর। নদী হইতে সংগৃহীত মুক্তা রাশি বস্তাবন্দী হইয়া চুঁচুড়ায় প্রেরিত হইত এবং সেই স্থানে নানারূপ প্রক্রিয়ার সাহায্যে সেইগুলিকে সংশোধিত করিয়া অতীব সূক্ষ্ম যন্ত্র সাহায্যে ছিদ্র করিয়া ব্যবহারোপযোগী করা হইত। কালীচরণের দ্বিতীয় পুত্র তথা মাণিকলালের পিতাঠাকুর মহাশয় শ্যামাচরণ ঐ সমস্ত কর্ম সম্পাদনে সুনিপুণ ছিলেন বলিয়া চুঁচুড়ার কারখানার দায়িত্বভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত ছিল। কারখানায় যে সমস্ত মুক্তা ব্যবহারের উপযুক্ত করা হইত, সেইগুলি কলিকাতায় কালীচরণের নিকট কলিকাতাস্থ দোকানে প্রেরিত হইত।

মুক্তা সংক্রান্ত যে কারখানার কথা উল্লেখ করিতেছি তাহা চুঁচুড়ার শুঁড়িপাড়ায় অধুনা হারাধন দাসের বাটীর ও তাঁহার উত্তরদিকে যেখানে নানারূপ বিপণী গড়িয়া উঠিয়াছে সেই স্থানে অবস্থিত ছিল। মাণিকলাল দত্ত মহাশয়ের জন্মস্থানও ঐ শুঁড়িপাড়ায়। যে গৃহে তাঁহার পুণ্য আবির্ভাব ঘটিয়াছিল সেই ইষ্টক নির্মিত দ্বিতল গৃহটি আজও বর্তমান রহিয়াছে।

মায়ের কৃপায় কালীচরণের ক্রমান্বয়ে ভাগ্যোন্নতি হইতে থাকিলে তিনি চুঁচুড়ায় বহু সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। নিত্য ভজন সাধনের জন্য শুঁড়িপাড়ায় শ্রীশ্রী৺রাধারমণজীউ ঠাকুরের মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহা আজও তাঁহার ঈশ্বরানুগত্যেরই সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

কালীচরণ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিতাইচরণ দত্ত তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাচরণ দত্ত অপেক্ষা অধিক বিদ্বান ছিলেন ও কলিকাতায় কর্মে নিযুক্ত হেতু জানবাজারে অবস্থান করিতেন। কামার পাড়া বাজারে কালীচরণের বসতবাটীর পশ্চাৎদিকে যে পুষ্করিণী রহিয়াছে তাহার পশ্চিম তীরে দে-পাড়ায় বর্দ্ধনদের

বাটীতে কালীচরণ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাচরণের বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই যুগে যদিও স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন আধুনিক কালের মত এত ব্যাপক ছিল না, বিশেষতঃ সুবর্ণ বণিক সমাজে, তবুও শ্যামাচরণ দত্তের স্ত্রী, অর্থাৎ মাণিকলালের মাতা ঠাকুরাণী অতিশয় শিক্ষানুরাগিণী ছিলেন এবং বিদ্যার্জনে তাঁহার ছিল প্রবল আগ্রহ। বিদ্যাভাসের মানসে শ্যামাচরণের পত্নী বেশ কিছুকাল যাবৎ হুগলী শহরে অবস্থিত মিস্ রেক সাহেবী স্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ধর্মানুরাগী কালীচরণ দত্ত মহাশয়ের গুরুপ্রাপ্তি, গুরুদীক্ষা ও গুরু পরিচয়ের প্রামাণ্য উল্লেখ কোথাও পরিলক্ষিত হয় নাই; কিন্তু তাঁহার কলিকাতাস্থ দোকানের কর্মচারী ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাচরণ প্রমুখাৎ যে বৃত্তান্তধারা আমাদের শ্রুতিগোচর হইয়াছে, তাহাই মাত্র লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছি। মাণিকলালের অতি শৈশবাবস্থাতেই কালীচরণ সংসার ত্যাগী হইয়া যে অলৌকিক মহাপুরুষের অনুগমন করেন, তিনিই উত্তরকালে এক মহালগ্নে মাণিকলালের প্রতি অশেষ কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে বরণ করিয়াছিলেন - ইহা অবশ্য মাণিকলালের উক্তি হইতেই বর্ণিত হইতেছে।

একদিন কালীচরণ তাঁহার কলিকাতাস্থ মুক্তার দোকানে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে তাঁহার দোকানের দ্বারপ্রান্তে হঠাৎ এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি কালীচরণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, ''কিরে - যাবি না?'' উত্তরে কালীচরণ বলিলেন, ''প্রস্তুত প্রভু।'' ''তবে আয়'' — এই মন্তব্য করিয়া সাধু যেমন অগ্রসর হইতে থাকেন, মন্ত্রমুগ্ধের মত কালীচরণও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলিলেন। দোকান এবং সিন্দুকের চাবিগুচ্ছ পড়িয়া রহিল। তাঁহার কর্মচারীগণ কোন কিছু বক্তব্য রাখিতে ভরসা পাইল না, আর স্নেহের পুত্র শ্যামাচরণ তখন কলিকাতা হইতে তেইশ মাইল দূরে চুঁচুড়া শহরে। সপ্তাহকাল পরে বারাণসীধাম হইতে তাঁহার পিতার স্বহস্ত লিখিত এক পত্র শ্যামাচরণের হস্তগত হইল সেই পত্রই পিতার নিকট হইতে দুঃসংবাদ বহনকারী প্রথম ও চরম লিপি। পত্রে কালীচরণ তাঁহার স্নেহ ভাজন পুত্র শ্যামাচরণকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, ''আমি গুরুজীর নির্দেশে, তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছি, খোঁজ করিও না পাইবে না।'' ইহার পর শ্যামাচরণ অত্যন্ত নিরুৎসাহ ও বিচলিত হইয়া পিতার অবর্তমানে মুক্তার ব্যবসা অব্যাহত রাখা একপ্রকার অসম্ভব বিবেচনা করিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে কালীচরণের মুক্তা ও জড়োয়ার ব্যবসা রাজা, মহারাজা ও বিশেষ ধনী গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যাহাদের গৃহাভ্যন্তরে প্রামাণ্য পরিচয় ব্যতিরেকে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। কালীচরণ কলিকাতার দোকানে থাকিয়া এই ব্যবসা সংক্রান্ত আদান প্রদান স্বয়ং করিতেন বলিয়া তাঁহার পুত্র শ্যামাচরণের সেই সমস্ত ক্রেতা গোষ্ঠীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ কোনদিন ঘটে নাই। এমতাবস্থায় পিতার অবর্তমানে সেই ক্রেতাগোষ্ঠীর আস্থাভাজন হইবার পর্য্যায়ে নিজেকে উন্নীত করা দুরূহ বিবেচনা করিয়া দোকান বন্ধ করা ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। দোকানস্থিত সামান্য কিছু মুক্তাই শ্যামাচরণের হস্তগত হইয়াছিল। তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে তাহার পিতার অতর্কিত অন্তর্ধানের ফলে কর্মচারীরা দোকানের মুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যাদি তাঁহার দোকানে আগমনের পূর্বেই হস্তগত করিয়াছে। যাহা হউক, অবশিষ্ট যৎসামান্য মুক্তাদি বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিলেন তাহার দ্বারা পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত শেষ পত্রের উপর পোষ্ট অফিসের মোহর দৃষ্টে বারাণসীধামের উদ্দেশ্যে শ্যামাচরণ যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য নিরুদিষ্ট পিতার সন্ধান করিয়া তাঁহাকে গৃহাভিমুখী করা। বারাণসীধামে উপনীত হইয়া ব্যাকুল অন্তরে শ্যামাচরণ সাধু সন্তদের আশ্রমে, চটিতে ও নানান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তাঁহার পিতার অনুসন্ধান করিলেন এবং এই কারণে তাঁহার অর্থব্যয়ও হইল; কিন্তু পিতৃ-সন্দর্শনে বিফল মনোরথ হইলেন। পরন্তু ক্রমাগত সাধুসঙ্গে ও তাঁহাদের আস্তানায় দিনাতিপাত করিবার ফলে, তাঁহাদের চারিত্রিক প্রভাবগুণে নিজেও সাধু ভাবাপন্ন হন এবং তাঁহার আত্মিক উৎকর্ষতা ঘটে। কাশীধামের শিববাবা শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামীর অন্যতম আশ্রিত ছিলেন শ্যামাচরণ। দীর্ঘকাল গৃহে অনুপস্থিতির ফলে তাঁহার পুত্র-কন্যাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের মাতুলদের উপরেই ন্যস্ত ছিল। সাধু সঙ্গে সাধু প্রভাবযুক্ত শ্যামাচরণ জটাজুট সমন্বিত হইয়া দীর্ঘ ১২ বৎসর পর পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন বটে, কিন্তু গৃহের আকর্ষণ তাঁহার নিকট তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন হওয়ায় সাধুদের আশ্রমের উদ্দেশ্যে পুনরায় যাত্রা করেন। এইভাবে যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বকাল অতিবাহিত করিয়া অতি বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁহার চুঁচুড়াস্থ বাসভবনে পুনরায় ফিরিয়া আসেন ও জীবনের বাকি দিনগুলি অতিবাহিত করেন। শ্যামাচরণ পিতার শ্রাদ্ধাদি কখনও করেন নাই। বিধান চাহিলে সাধু সন্তরা তাঁহাকে উপদেশ দিতেন যে তাঁহার পিতা জীবিত। জীবিত মানবদের শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ। মাণিকলালও পরবর্তীকালে পিতামহের কোনরূপ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় বিরত ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর শ্যামাচরণ স্বহস্তে রন্ধনাদি

করিয়া ভোজন করিতেন। তিনি কখনও স্নান করিতেন না, কিন্তু সততই তাঁহাকে সদ্যোস্নাত মনে হইত। সাধুদের প্রদত্ত দৈব ঔষধাধি তাঁহার শিরোপরি জটা মধ্যে বাঁধা থাকিত, যাহা তিনি আর্ত্ত, পীড়িত, অনুরাগী ও আপনজনদের নিরাময়তা ও অন্যান্য কল্যাণোদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিতেন। তিনি সপ্ত পুত্র ও এক কন্যার জনক ছিলেন; তন্মধ্যে মাণিকলাল ছিলেন সর্বাগ্রজ। ১৯৪৫ সলে চুঁচুড়াস্থ কামার পাড়ার বাসভবনেই তাঁহার তিরোধান ঘটে। *...ক্রমশঃ*

—শ্রীমাণিকলাল দত্তের শিষ্য,

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়

আশ্রম সংবাদ

১৫ই জানুয়ারী — শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের আসন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন প্রাতঃকালে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের পূজা ও যজ্ঞ। দ্বিপ্রহরে আমাদের গুরুভ্রাতা ও ভগিনীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বহু ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করেন। শিবরামপুরে অবস্থিত শিশু বিদ্যালয়ের (ঐক্যতান) সকল শিশুগণও আমন্ত্রিত ছিল। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পণ্ডিত গিরিধারী নায়েকের 'ওড়িসি আশ্রমের' শিক্ষার্থীরা নৃত্যপরিবেশন করেন। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের শুরুতে হিরণ্যগর্ভের পূর্ববর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

৩১শে জানুয়ারী - ২রা ফেব্রুয়ারী — আশ্রমে তিন দিন ব্যাপী শ্রীশ্রীগণেশ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ৩১শে জানুয়ারী প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীবালগণেশের পূজা দিয়ে এই পবিত্র অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পূজার পর যজ্ঞ, ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ বিতরণ করা হয় উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে। সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয় এক দৃষ্টিনন্দন নৃত্যানুষ্ঠান 'শ্রীগণেশ'। নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন শ্রীমতী সুতপা বসু, শ্রীমতী পৌলমী মুখার্জী ও শিশুশিল্পী অশোকা বসু, আরবরাজ ব্যানার্জী ও শ্রদ্ধা দাসগুপ্ত। ১লা ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীসিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা আরম্ভ হয়। পূজার পর যজ্ঞ, ভোগ বিতরণ ও সন্ধ্যায় গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ পরিবেশন করেন একটি মনোগ্রাহী সঙ্গীতানুষ্ঠান। ২রা ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীমহাগণেশের পূজা, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ভোগ বিতরণের পর সন্ধ্যায় ভজনগীতির মাধ্যমে অতি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় শ্রীশ্রীগণেশ যজ্ঞ।

১৯শে ফেব্রুয়ারী — শ্রীশ্রীমা আশ্রমস্থ কয়েকজন সহ হোটর আশ্রমের বার্ষিক উৎসবে যান। সেখানে শ্রীশ্রীমাকে পূজা ও আরতির মাধ্যমে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সাধ্বী সুচেতানন্দময়ী ও সাধ্বী পুণ্যানন্দময়ী। আশ্রমের ব্রহ্মচারিণী ও শিষ্যাগণও এক-এক করে শ্রীশ্রীমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরিশেষে আশ্রমের বিদ্যার্থীরা একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। সন্ধ্যায় অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত।

২৪শে ফেব্রুয়ারী — শিবরাত্রির সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমা নিজ হস্তে একান্তে শিব পূজা করেন। মধ্যরাত্রে যজ্ঞগৃহে শ্রীযজ্ঞনারায়ণদা শিবরাত্রির যজ্ঞকার্য সম্পন্ন করেন।

১২ই মার্চ — দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে আশ্রমে দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীরাধামাধবের ভোগ নিবেদিত হয়। সন্ধ্যায় নৃত্যানুষ্ঠানে

পণ্ডিত গিরিধারী নায়েকের শিষ্যাবৃন্দ দ্বারা পরিবেশিত হয় বসন্ত উৎসবের মনোরম নৃত্য।

২৬শে মার্চ — আধ্যাত্মিক সভার ২২তম পর্বে 'কঠোপনিষদ্ প্রসঙ্গে' ব্যাখ্যান পরিবেশন করেন শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান ডঃ বরুণ দত্ত।

৪ঠা এপ্রিল — নবরাত্রির অষ্টমী তিথির সকালে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মায়ের পূজা হয় অন্নপূর্ণা মন্দিরে। পূজা ও ভোগ নিবেদনের পর উপস্থিত সকল শিশু ও ভক্তগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

৫ই এপ্রিল — এইদিন সন্ধ্যায় আশ্রম মন্দিরে রামনবমী উপলক্ষ্যে একটি সুন্দর ভজনের অনুষ্ঠান হয়।

১৪ই এপ্রিল — শ্রীশ্রীমায়ের আগমন হেতু বহুভক্তবৃন্দ এইদিন সমবেত হয়েছিলেন গুরুভ্রাতা শ্রীরাজেন্দ্র সেঠিয়ার গৃহে। সঙ্গীত ও সৎসঙ্গে সন্ধ্যা নির্বাহের পর ভক্তবৃন্দ পরিতৃপ্তি সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

रुद्रावतार गोरक्ष नाथ

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

एक समय ऐसा था जब समग्र विश्व में सर्वाधिक ऐश्वर्यशाली एवं उन्नत धर्म और साधन मार्ग के अधिकारी थे 'नाथ' योगी सम्प्रदाय। सटीक भाव से अनुधावन करने से यह देखा गया कि समस्त धर्मों ने शैव-योग धर्म से कुछ ना कुछ साधन प्रणाली ग्रहण किया है। तदनींतन शैवयोग-धर्मावलम्बियों को 'नाथ' कहकर अभिहित किया जाता था। 'नाथ' का अर्थ है प्रभु। नाथ गुरुगण सकल के प्रणम्य थे। नाथ सिद्धगण जातिभेद की संकीर्ण विचारधारा को स्वीकार नहीं करते थे। वे यथार्थ में प्रकृत सदाचारनिष्ठ साम्यवाद के मूर्त प्रतीक थे। जाति-धर्म-वर्ण निर्विशेष समस्त जन को वे अपना लेते एवं उन्हें प्रदान करते अकृत्रिम स्नेह और प्रेम इसीलिए समस्त श्रेणी के मनुष्य उन्हें आन्तरिक-भाव से श्रद्धा ज्ञापन करते एवं उनमें स्वत:स्फूर्त भक्ति उत्सारित होती थी। प्राचीन युग में नाथ योगीगणों का प्राधान्य सबसे अधिक था। नाथगण थे रुद्रज ब्राह्मण।

ब्रह्मवैवर्त पुराण के अष्टम और नवम अध्याय में वर्णित है कि ब्रह्मा के ललाट से रुद्रज ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के ललाट से 'महान' आदि एकादश रुद्र के विषय में बताया गया है। ये एकादश रुद्र ही हुए रुद्रज ब्राह्मणों के आदि पुरुष। ये सभी थे योग-साधक महायोगी। रुद्रज ब्राह्मण हुए निवृत्तिमार्ग के ज्ञानकाण्डी ब्राह्मण। वे थे मानव कल्याण के व्रती। योगसाधना के माध्यम से उन्होंने असंख्य विभूतियाँ लब्ध की थी। उन्होंने ऐसी-ऐसी शक्तियाँ अर्जन की थी जिन्हें हम अलौकिक की संज्ञा देते है। योगसाधन तपस्या की सहायता से वे इन्द्रियादि जय कर स्वयं ही अपनी देह और मन के अधीश्वर हुए एवं प्राप्त किए कैवल्य मुक्ति का उपाय। शैवयोगधर्म का प्रचार नाथ योगियों ने किया। उनके प्रधान आराध्य हुए परमब्रह्म योगीश्वर शिव। उनमें से अनेकों ने योगसाधना के माध्यम से शिवस्वरूपत्व को प्रत्यक्ष भाव से ज्ञात कर शिवत्व प्राप्त किया। योग प्रभाव से आदिनाथ शिव, तत्शिष्य मत्स्येन्द्रनाथ या मीननाथ, तत्शिष्य गोरक्षनाथ प्रमुख योगीश्वरगण अपने जीवनकाल में ही शिवावतार रूप में जगत् में पूजित हुए। त्रेतायुग में अद्वैतब्रह्म परमज्योति भगवान शिव ने श्रीरामचन्द्र से कहा था – 'केवल सूक्ष्मद्रष्टा योगी ही मेरे स्वरूप की उपलब्धि कर पाते है' –(श्रीश्रीशिवगीता)। द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने योग और योगियों को उच्चतम स्थान दिया था।

नाथ योगी 'गोरक्ष नाथ'। 'गो' का अर्थ विश्व एवं 'रक्ष' का तात्पर्य रक्षा करना अथवा रक्षणावेक्षण करना। अतएव विश्व की रक्षा करते हैं जो या विश्व का रक्षणावेक्षण करने वाले ही हैं गोरक्ष नाथ। तपस्वी, संयमी, व्रतपरायण, अणिमादि अष्टविध योगैश्वर्य सिद्ध रुद्रोत्पन्न ब्राह्मणों को 'नाथ' कहा जाता है। यहाँ 'नाथ' का तात्पर्य त्रिभुवन के पालनकर्त्ता परमेश्वर शिव को ही व्यक्त करता है। शैव-दर्शन के मतानुसार भगवान शिव ही जगत् के आदि कारण है। इसीलिए भगवान शिव का नाम 'नाथ' शब्द से युक्त रहता है। जैसे - विश्वनाथ, काशीनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ इत्यादि। योगीगण जो परमेश्वर शिव के उपासक है वे शैव कहलाते हैं एवं वे अपने को शिव-सन्तान मानते है। अत: वे भी 'नाथ' उपाधि से भूषित हुए। मीननाथ भगवान शिव के शिष्य-सन्तान थे और उनके सन्तान-शिष्य हुए गोरक्षनाथ। योगीराज मत्स्येन्द्रनाथ और गोरक्षनाथ के कार्यकलापादि का भारत के अतिरिक्त नेपाल, चीन, तिब्बत प्रभृति देशों में भी विस्तार हुआ है एवं वे शिवावतार रूप में सर्वत्र पूजित होते हैं।

'नवनाथ भक्तिसार' नामक ग्रंथ में गोरक्षनाथ के जन्म के संबंध में एक अद्भुत कहानी है –

गोरक्षनाथ के गुरु मत्स्येन्द्रनाथजी ने तीर्थ पर्यटन काल के समय बंग-प्रान्त के धारा नगरी में 'सरस्वती' नामक एक

रमणी के निकट भिक्षा ग्रहण की; उस रमणी को कोई सन्तानादि नहीं थी। भिक्षा दान करते हुए उस रमणी ने उन्हें एक महातेजस्वी सिद्ध संत समझते हुए भिक्षा दानान्त उनसे पुत्र वर की याचना की। मत्स्येन्द्रनाथजी ने कृपापरवश होकर उस रमणी को कुछ विभूति प्रदान की एवं कहा कि यह विभूति सेवन करने से यथा समय उनको पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी।

महात्मा के प्रस्थान कर जाने के उपरांत अन्यान्य रमणीगण उससे उस संबंध में उपहास करने लगीं। इससे साधु प्रदत्त वस्तु के प्रति सरस्वती की आस्था चली जाती है। तब विक्षुब्ध होकर रमणी उस विभूति प्रसाद का भक्षण ना कर गोरक्षा (गोबर के आवर्जनादि फेंकने का स्थान) में निक्षेप कर देती है। १२ वर्षों के पश्चात् मत्स्येन्द्रनाथजी ने पुनराय इस रमणी के यहाँ आगमन किया और भिक्षा के लिए याचना की। रमणी भिक्षा देने के लिए जैसे ही प्रवृत्त हुई उन्होंने उससे जिज्ञासा किया – ''तुम्हारा पुत्र कहाँ है?'' विभूति का सेवन नहीं किया गया, यह सुनकर उन्होंने कहा – ''मेरी उस सिद्ध विभूति ने निश्चय ही पुत्ररत्न प्रसव किया है; जहाँ वह विभूति रक्षित की गई है, वहाँ चलो।'' वहाँ उपस्थित होकर मत्स्येन्द्रनाथजी ने पुत्र का आह्वान किया एवं आश्चर्य का विषय यह था कि उसी समय बारह वर्ष का वयस्क बालक गोरक्षा से उठकर मत्स्येन्द्रनाथजी के निकट दण्डायमान हुआ। इस गोरक्षा से उनका नाम 'गोरक्षनाथ' हुआ। उसी समय उन्होंने मत्स्येन्द्रनाथजी के साथ वहाँ से प्रस्थान किया। – इस किंवदन्ती से प्रज्ञा बुद्धि द्वारा यह समझा जा सकता है कि गोरक्षनाथ अपनी पूर्वावस्था में कायाकल्प योगसिद्ध अवस्था से अयोनिसम्भवा सत्ता रूप में गुरु मत्स्येन्द्रनाथ के आवाहन पर आविर्भूत हुए थे।

प्रज्ञालोक से यह जाना जाता है कि मत्स्येन्द्रनाथादि शिवकल्प महायोगीश्वरगण एकादश रुद्र के अवतार थे।

एकादश रुद्र की कथा :– सनकादि पुत्रों को सृष्टिकार्य में निरपेक्ष देखकर ब्रह्मा अतिशय दु:खित हुए। तब विष्णु ने उन्हें स्मरण करवा दिया कि ब्रह्मा ने पूर्व में शिव को पुत्ररूप में पाने के लिए इच्छा प्रकट की थी। तब ब्रह्मा दु:साध्य तपस्या में प्रवृत्त हुए। दीर्घकाल पर्यन्त तपस्या में निरत रहने के उपरांत भी कोई फल न मिलने पर वे बहुत क्रोधित हुए फलस्वरूप उनके नयनद्वय से अश्रुबिन्दु अखिल भूतल में गिरने लगे। उन अश्रुबिन्दुओं से बहुसंख्यक भूत-प्रेत उत्पन्न होने पर उनके दर्शन से ब्रह्मा क्रोध मिश्रित दु:ख के साथ मूर्च्छित होकर गिर पड़े। तब ब्रह्मा के शरीर से करुणस्वर से रोदन करते-करते एकादश 'रुद्र' आविर्भूत हुए। वे रोदन करते-करते बहिर्गत हुए इसीलिए उनका नाम हुआ 'रुद्र'। एकादश रुद्र के आविर्भाव के पश्चात् महादेव द्वारा ब्रह्मा को संज्ञा दान करने के पश्चात् ब्रह्मा के ललाट से इन एकादश रुद्र के प्रभु स्वरूप 'आदि रुद्र' देव भी प्रादुर्भूत हुए। ये आदि 'रुद्र' देव हुए स्वयं शिव (महादेव)। यही रुद्र प्रथम में ब्रह्मा को पुनर्जीवन दान कर पश्चात् में उनके ही पुत्र स्वरूप हुए। संज्ञा प्राप्त कर ब्रह्मा ने 'प्रभु रुद्र' से उनका परिचय पूछा। प्रभु रुद्र ने तब ब्रह्मा को स्मरण करा दिया कि ब्रह्मा की पूर्व प्रार्थना के अनुसार ही वे उनके पुत्र रूप में आविर्भूत हुए –(वायु और कूर्म पुराण)। फिर, शिव पुराण में है कि महादेव के अंश से ही 'रुद्र' नाम के एक देव उत्पन्न हुए। महादेव के अंशोद्भव होने के कारण वे सामर्थ्य में महादेव से किसी भी क्रम में न्यून नहीं है। 'रुद्र' प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। महादेव ने ब्रह्मा के ललाट से रुद्र का सृजन किया। ये रुद्र तमोगुण प्रधान अर्थात् ब्रह्म-योगगम्या। वैदिक मतानुसार, रुद्र प्राचीन वैदिक ऋषियों के अन्यतम देवता। ऋषियों ने रुद्र के संबंध में अनेक ऋक् मन्त्रों की रचना की है। अनेक स्थलों में ऋषियों ने अग्नि को ही 'रुद्र' नाम से अभिहित किया है; फिर किसी-किसी स्थल में ब्रह्मा को ही रुद्र कहा गया है। – ऋक् १/३९/४; १) मत्स्येन्द्रनाथ, तत्शिष्य गोरक्षनाथ एवं तत्शिष्य नवनाथ समष्टिगत भाव में एकादश रुद्र के अंशसम्भूत शिवगण। इन सभी ने भगवान शिव से 'परम योग' प्राप्त कर कठोर साधना द्वारा सिद्धि लब्ध कर जगत् के कल्याण-कर्म में स्वयं को नियुक्त किया। गोरक्षनाथ के जन्म संबंध में अनेक कहानियाँ प्रचलित है। उनमें से 'गोरक्ष पुराण' की यह कहानी सर्वपेक्षा प्रचलित है। लेकिन नाथधर्म के अनुसार गोरक्षनाथ हुए अयोनिसम्भवा, परब्रह्म निरंजन की काया से उनका उद्भव हुआ है। गोरक्षविजय ग्रन्थ में उल्लेखित है कि महादेव की जटा से गोरक्षनाथ का जन्म हुआ है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि अलख निरंजन स्वरूप शिवब्रह्म के साथ गोरक्षनाथ अभिन्नभाव में योगसूत्र स्थापित है। इस प्रसंग से बोधगम्य होता है कि गोरक्षनाथ 'शिवावतार' थे। गोरक्षपुर या गोरखपुर

में गोरक्षनाथ का तपोलब्ध आसन प्रतिष्ठित है। ऐसा माना जाता है कि त्रेतायुग से यह आसन प्रतिष्ठित है। इसकी पुष्टि गम्भीरनाथ जी ने की थी। गोरखपुर में गोरक्षनाथजी का मन्दिर त्रेतायुग में निर्मित है कि नहीं जिज्ञासा करने पर बाबा गम्भीरनाथजी ने कहा कि –''नहीं, किन्तु आसन त्रेतायुग से ही है।'' सम्राट अलाउद्दीन खिलजी के समय एकबार एवं सम्राट औरंगजेब के शासन काल में पुनः इस स्थान के मन्दिर को ध्वंस कर दिया गया लेकिन उस समय आसन की रक्षा की गई। नाथ सम्प्रदाय के साधु गोरक्षपुर को गोरक्षनाथ का आदि साधन क्षेत्र मानते है एवं वही आसन उनकी तपस्या के समय से वहाँ प्रतिष्ठित है। गोरक्षनाथ की तपोस्थली भी उनके ही नामानुसार परवर्तीकाल में 'गोरखपुर' कहकर परिचित हुई। अन्य प्रवाद अनुसार गोरक्षनाथ का प्रथम तपस्या स्थल बदरिकाश्रम। गुरु मत्स्येन्द्रनाथ नवीन सन्यासी गोरक्षनाथ को बदरिकाश्रम में ले जाकर वहाँ उन्हें द्वादश वर्षव्यापी शैवयोग में कठोर तपस्या में रत किया। सिद्धिलाभ कर वे धर्मप्रचारार्थ नेपाल प्रभृति स्थानों में प्रेरित हुए। इसके पश्चात्, सम्भवतः तपस्या से सिद्धिलाभान्त में गोरक्षनाथ ने गोरक्षपुर आकर अपना आसन प्रतिष्ठित किया था।

समस्त प्रवाद से जाना जाता है कि सत्ययुग से आरम्भ कर ईसा के पंचदश शतक पर्यन्त महायोगी गोरक्षनाथ के अस्तित्व के कई प्रमाण मिलते है। अतएव सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि – इन चारों युगों में ही गोरक्षनाथ के प्राकट्य-प्रमाण मिलते है। गोरक्षनाथ के सम्प्रदायभुक्त साधुओं के मध्य एक विश्वास-प्रवाद है कि गोरक्षनाथ अमर महात्मा है एवं सूक्ष्म शरीर में वे इस समय भी वर्तमान है; लोकहितार्थ उन्होंने विभिन्न स्थानों में विचरण किया एवं किसी-किसी भाग्यवान पुरुष ने उनके दर्शन पाकर स्वयं को कृतार्थ किया। हमारे श्रीश्रीसरोजबाबा जब हिमालय के दुर्गम स्थानों में परिव्रज्या कर रहे थे उस समय एकबार मानस सरोवर जाने के मार्ग में एक गुहा में एक अति प्राचीन ऋषि-महात्मा का दर्शन किया। उन महायोगी पुरुष की अति शीर्णकाया, उनके मस्तक से जटाओं का प्रसार मिट्टी पर्यन्त था, ऐसी कि उनके चक्षुद्वय के पलकों से होती हुई पतली-पतली जटाएँ निकल कर कपोल को आवृत कर रही थी। महायोगी के नयनद्वय निमीलित एवं उनके सम्मुख में धूनी प्रज्ज्वलित हो रही थी। सरोजबाबा के उनके सम्मुख जाकर दण्डायमान होने पर जब उन्होंने अपने हस्त द्वय द्वारा चक्षुद्वय के ऊपर गिरी हुई जटाओं को हटाकर चक्षु उन्मीलित किया तो देखा गया कि उनके नयनों से ज्योति की छटा निर्गत हो रही है एवं उन्होंने कहा – ''सप्तम पुरुष''। परवर्ती में सरोजबाबा यह समझे कि ये हैं कायाकल्प सिद्ध अति प्राचीन महायोगी गोरक्षनाथ स्वयं एवं सरोजबाबा हुए इनके वंश के सप्तम पुरुष, जो साधु बने। हठ्योगसिद्ध जीवन्मुक्त महापुरुषगण इच्छामात्र से ही अपने योगशक्ति बल से युगयुगान्तव्यापी जीवित रह सकते है।

महायोगी गोरक्षनाथ के जन्मग्रहण के विषय में जैसे अनेक मत प्रचलित है वैसे ही उनके तिरोधान और समाधिस्थल के सम्पर्क में भी मतभेद है। गोरक्षनाथ के तिरोधान और समाधि-स्थान दोनों ही अपरिज्ञात है।

कानफाट्टा योगी सम्प्रदाय दावा करते है कि गोरक्षनाथ ही इस सम्प्रदाय के प्रतिष्ठाता हैं एवं ईसापूर्व १५०० अब्द में इस सम्प्रदाय का उद्भव हुआ। योगाचार्य गोरक्षनाथ असाधारण पाण्डित्य के धनी थे। उन्होंने समग्र विश्व में भ्रमण कर शैवनाथ धर्म की अमृतवाणी का प्रचार किया एवं असंख्य शास्त्र लिखे जो साहित्य जगत् की एक अनवद्य सम्पद है। उन्होंने ही सर्वप्रथम हिन्दीभाषा में काव्य रचना की थी; इसीलिए वे हिन्दी भाषा और साहित्य के जनक कहलाते है। उनके द्वारा रचित ग्रंथों में योगबीज, गोरक्षपद्धति, सिद्धसिद्धान्त पद्धति, गोरक्षबोध, ज्ञानसिद्धान्त योग, गोरक्ष योगतंत्र, हठयोग, गोरक्षगीता, गोरक्ष संहिता इत्यादि प्रसिद्ध है।

–हन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

–ओम् नमः रुद्राय–

अन्तःस्थित भावराज्य में जो सदा मन को निबद्ध रख सकते है उन्हें बहिर्जगत् की कलुषता स्पर्श नहीं कर पाती। कुविचार द्वारा मनोबल नष्ट होता है और वे मानुष को अमानुष में परिवर्तित कर देते हैं। मन को सर्वदा उन्नत स्तर में रखने की कोशिश करने से निम्न स्तरीय विचारों से वह प्रभावित नहीं होता। **–श्रीश्रीप्रणवानन्द महाराज**

श्रीकृष्ण की तपस्या

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीकृष्ण वासुदेव बदरिकाश्रम में सहस्र वत्सर व्यापी केवल एक सनातन महेश्वर की आराधना कर उनके प्रसाद से जगद्विख्यात और सर्वभूतों के प्रियतम हुए थे। वे प्रत्येक युग में अविचलित भक्तिभाव से उन शाश्वत चराचर के गुरुस्वरूप महादेव की आराधना में निरत रहे। उन्होंने द्वादश वर्षों की कठोर तपस्या के व्रत का अनुष्ठान सम्पूर्ण करके महादेव की आराधना द्वारा देवी रुक्मणी के गर्भ से कतिपय महाबली पुत्र प्राप्त किए थे। महावीर प्रद्युम्न के निहत होने के पश्चात् द्वादश वर्ष व्यतीत होने के उपरांत श्रीकृष्ण की अन्यतम महिषी जाम्बवती ने उनसे एक महाशक्तिशाली पराक्रान्त पुत्र के लिए प्रार्थना की। देवी जाम्बवती की प्रार्थना पूर्ण करने के मानस वे महादेव की आराधना में प्रवृत्त हुए। वे पहले महर्षि उपमन्यु के आश्रम में उपनीत हुए एवं उनसे महादेव की अपार महिमा के संबंध में श्रवण कर उनके प्रताप से अवगत हुए तथा महर्षि के उपदेशानुसार महादेव की आराधना में नियुक्त हुए। महर्षि उपमन्यु ने वासुदेव का मस्तक मुण्डन कर उन्हें दण्ड, कुश, चीर और मेखला प्रदान कर शास्त्रानुसार दीक्षित किया। तत्पश्चात् श्रीकृष्ण ने एकमास तक फलाहार किया एवं चार महीने पर्यन्त सिर्फ जल का सेवन कर ऊर्द्धबाहु करके एक पद पर अवस्थान किया। अनन्तर छः मास अतिवाहित होने पर, देवदेव महादेव पार्वती सह आकाश में एक मेध के मध्य अवस्थान पूर्वक उनके समक्ष आविर्भूत हुए। इस पर श्रीकृष्ण परम भक्तिरस में आप्लूत होकर महादेव की स्तुति करने लगे। उनके स्तव से परम परितुष्ट होकर महादेव ने उन्हें आठ वर के लिए प्रार्थना करने को कहा। तब श्रीकृष्ण ने कृतांजलिपुट से उनके निकट धर्म में दृढ़ता, रणस्थल में शत्रुनाश की क्षमता, परम यश, बल, योग, लोकप्रियता, परमेश्वर का सान्निध्य और असंख्य पुत्रों के लिए याचना की। महादेव ने प्रसन्न होकर वासुदेव की समस्त प्रार्थनाओं को पूर्ण किया। देवी पार्वती ने भी संतुष्ट होकर श्रीकृष्ण को ब्राह्मण के प्रति प्रसन्नता, पिता का अनुग्रह, शतपुत्र, उत्कृष्ट भोग, कुलानुराग, माता की प्रसन्नता, शान्तभाव और कार्य में निपुणता, ये आठ प्रकार के वर प्रदान किए। इसके अतिरिक्त पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि वासुदेव का अमरगण-तुल्य प्रभाव रहेगा सत्यानुरागिता, षोड़श सहस्र भार्या, भार्याओं का अनुराग, अक्षय धनधान्य, बंधुओं की प्रीति और मनोहर शरीर लब्ध करेंगे।

इसी समय नारद, पर्वत, व्यासदेव प्रभृति महर्षिगण और सिद्धगणों ने उनके साथ साक्षात् करने के लिए बदरिकाश्रम में गमन किया। वासुदेव द्वारा समागत महर्षियों का यथोचित सत्कार करने पर वे सभी विभिन्न वर्ण के आसनों पर उपवेशन कर धार्मिक समालोचना में व्यापृत हुए। तब हठात्, वासुदेव नारायण के देह से ब्रह्मचर्यजनित तेजोराशि बहिर्गत होकर समागत समस्त महर्षिगणों के समक्ष में ही श्वापद-संकुल, वृक्षलतादि समाकीर्ण पर्वत को दग्ध करने लगी। क्रमशः वह तेज अग्निशिखा पर्वत के शिखर समुदय को भस्मीभूत कर शिष्य के सदृश वासुदेव के निकट आ कर उनके चरणों में पतित हुई। तब श्रीकृष्ण ने उस पर्वत को दग्धप्राय देखकर दयाद्र- चित्त से उसके प्रति दृष्टिपात किया। तभी अकस्मात् वह पर्वत पूर्ववत् वृक्षलता समाकीर्ण और पशुपक्षी-श्वापदादि संकुल हो उठा। महर्षिगण उस आश्चर्यजनक घटना को देखकर विस्मयाविष्ट चित्त से वासुदेव से इस समस्त घटना का रहस्य पूछा। उनके कौतुहल के निवारण हेतु वासुदेव ने कहा कि जिन महर्षियों ने प्रलयाग्नि के सदृश जिस तेज को श्रीकृष्ण की काया से निर्गत होते हुए देखा था, वह था उनका 'वैष्णव' तेज। आत्मतुल्य पुत्र-लाभार्थ वे इस पर्वत पर कठोर तपस्या में नियुक्त हुए थे इसीलिए उनकी देहस्थित आत्मा अग्निरूप में निर्गत होकर पितामह ब्रह्मा के निकट गमन किया था। बाद में महादेव के तेज का अर्द्धांश उनके पुत्ररूप में परिणत होगा; ब्रह्मा से यह विषय श्रवण कर, उस अग्निरूपी आत्मा ने पुनराय श्रीकृष्ण के पास लौटकर शिष्य की तरह उनकी पदवन्दना कर शान्तभाव का अवलम्बन किया।

चूँकि महादेव ने अम्बिकासह श्रीकृष्ण को पुत्रवर दिया था, इसीलिए श्रीकृष्ण ने शिवदत्त तनय का नाम रखा 'साम्ब'।

(*सहायक ग्रंथ : विभिन्न पुराण और महाभारत-अनुशासन पर्व*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा

प्रसंग (३४) : एकदिन अंशुमान (श्रीश्रीबाबा के अन्यतम सन्तान अंशुमान बैनर्जी) की तीव्र इच्छा हुई दादा को अपने घर से मछली का झोल लाकर अपने हाथ से खिलाने की। किन्तु अंशुमान उस समय साधारणतया दादा के

गृह में ही रहते थे एवं वहीं पर खाना-पीना करते। इसीलिए रामराजातल्ला बाजार से मछली खरीद कर दादा की स्त्री को देकर उसे बनवाया। कुछ समय पश्चात् दादा जब खाना खाने बैठे तब (वहाँ उस समय आशीषदा उपस्थित थे) उन्होंने दादा को मछली खाने के लिए दिया। किन्तु दादा वह मछली खाना नहीं चाहते थे। कहा, ''अभी खाने की इच्छा नहीं हो रही है। फिर भी अंशुमान के अनेक बार आग्रह करने पर दादा ने अनिच्छा से मछली खायी। खाना समाप्त हो जाने के पश्चात् जो अवशिष्ट मछली का झोल था, आशीषदा को उसे थोड़ा चख कर देखने से मालुम पड़ा कि वह बहुत ही तिक्त स्वाद का था। इतना तिक्त-स्वाद था कि आशीषदा ने दोबारा मुँह तक ले जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाए। इससे आशीषदा अवाक् रह गये कि इतने कड़वे स्वाद की मछली दादा ने अपने गले से नीचे कैसे उतारी? वास्तव में हुआ यह था कि मछली का पित्त पिघल जाने से उसका तिक्त स्वाद मछली में फैल गया और झोल का स्वाद भी कटु हो गया था। तब आशीषदा ने दादा से कहा, ''दादा, आपने इतनी तिक्त मछली कैसे खायी?'' दादा ने कहा, ''अंशुमान ने इतने प्रेम से खाने के लिए कहा था मैं कैसे न खाता?''

महात्मा भक्त की आंतरिक भक्ति देखते है, वे बाहरी विषयों पर इतना लक्ष्य नहीं करते। भक्तों के निश्छल प्रेम के दान को वे निर्विकार होकर ग्रहण करते है। इस घटना का अन्य पहलु भी शिक्षणीय है कि महात्माओं की इच्छा के विरुद्ध जाना फलदायक नहीं होता। सद्गुरु की इच्छा के विरुद्ध कभी भी अपनी कामना-वासना चरितार्थ नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सद्गुरु से जिज्ञासा करके ही कर्म करना उचित है अन्यथा अधिकतर क्षेत्र में विडम्बनाओं को झेलना पड़ता है।

प्रसंग (३५) : यह घटना आशीषदा के समक्ष ही घटी थी, अतएव आशीषदा के मुखनि:श्रित भाषा से ही घटना का प्रकाश कर रहा हूँ।

–''कोई एक वयस्क भक्त दादा के समीप बैठे रहते; उस भद्रव्यक्ति के नाक के भीतर (ओजिना) से अत्यंत दुर्गन्ध आती थी। वह दुर्गन्ध बीच-बीच में आस-पास फैल जाती। एकदिन उस सज्जन से मैंने कहा, ''क्या बात है बोलिए तो? आपके नासिका से ऐसी गंध क्यों आती है?'' उन्होंने कहा, ''अनेक चिकित्सकों से परामर्श लेकर उपचार किया है लेकिन सटीक इलाज न होने के कारण यह ठीक नहीं हो पा रहा है।'' वे व्यक्ति दादा से कुछ दूर ही बैठे थे। इसके दो दिन बाद, मैं दादा के पास बैठा हूँ एवं दादा के नाक से ठीक वैसी ही दुर्गन्ध आ रहीं है जैसी उन भद्रलोक से आती थी। दादा से कहा, ''यह क्या हुआ, दादा यह रोग कहाँ से आया? यह कष्ट तो आपको नहीं था।'' दादा ने कोई उत्तर नहीं दिया। दो एक दिन में ही दादा की नाक ठीक हो गयी। कुछेक दिनों पश्चात् जब वे सज्जन पुन: आए तो देखा कि उनके नाक से किसी भी प्रकार की दुर्गन्ध नहीं आ रही है। इसीलिए हमलोग अपनी अस्वस्थता के विषय में दादा को नहीं बताते थे।

महापुरुष अव्यक्तभाव से दूसरों के रोग ग्रहण करते है। कईबार तो रोगी यह जान भी नहीं पाता कि उसने महात्मा की कृपा प्राप्त की है। सद्गुरुरूपी महात्मादि इतने ही करुणामय होते है। इसीलिए कहते है रोगमुक्ति के लिए महात्माओं के समक्ष प्रार्थना करना उचित नहीं है। वरंच रोगमुक्ति की कामना ना करते हुए, रोगमुक्ति का पथ्य जानकर, स्वयं के प्रारब्ध कर्मों को सत्कर्मों द्वारा क्षय करने का पथ जान लेना चाहिए।

प्रसंग (३६) : एकदिन मास्टर महाशय के गृह में हम लोग कुछ गुरुभाई एक साथ सद्-समालोचना करने के लिए बैठे थे; उनमें मैं (प्रदीप चैटर्जी) सम्मिलित नहीं था। आशीषदा, असीमदा प्रभृति और भी कुछेक जन वहाँ थे। उस समय तक मैं गुरुमहाराज के सान्निध्य में नहीं आया था। इन मास्टर महाशय के संबंध में कुछ परिचय देना चाहता हूँ।

मास्टर महाशय का नाम था श्रीप्रणवेश घोष; वे पद्मपुकुर रेल स्टेशन के सिग्नल-मैन थे। परवर्तीकाल में वे साँतरागाछि रेल स्टेशन के सिग्नल स्टेशन-मास्टर हुए। अत्यंत दायित्व के साथ और निपुणता से वे अपना कार्यभार संभालते थे। इसके साथ-साथ अपने कर्तव्य के प्रति गहरी निष्ठा द्वारा वे सभी के मध्य मास्टर महाशय कहकर परिचित थे। वे जिस समय हमारे श्रीश्रीबाबा के सान्निध्य में थे उस समय हमारी श्रीश्रीमाँ का भी बाबा के यहाँ आना-जाना था। श्रीश्रीमाँ से सुना है कि मास्टर महाशय बाबा के दीक्षित एक सुउन्नत क्रियावान थे। वे प्राय: प्रत्यह ही श्रीश्रीबाबा की सेवा करने के लिए गुरुगृह में आते थे। श्रीश्रीमाँ ने हमें अवगत करवाया कि श्रीश्रीबाबा के निकट लिंगशरीर में जो अनेक महात्मा नित्य आते थे, श्रीश्रीबाबा ने मास्टर महाशय का उन महात्माओं से प्रत्यक्ष करवाया था। ये मास्टर महाशय श्रीश्रीबाबा के जन्मजन्मांतर से अंतरंग थे। इस प्रसंग को अनेक भक्त जानते थे अतएव मास्टर महाशय के आवास स्थल पर समस्त जन एक साथ बैठकर आध्यात्मिक वार्तालाप करते थे।

जो भी हो, मैं पुन: पूर्व प्रसंग पर लौट कर आता हूँ। उस समालोचना में ऐसा कोई प्रसंग उत्थापित हुआ था जिसमें अध्यात्म-समालोचना से अलग कोई अप्रासंगिक विषय था, हो सकता है किसी के संबंध में विशेष कोई विवरण हो; उस तथ्य के संदर्भ में आशीषदा विशेष कोई मन्तव्य रखना चाहते थे लेकिन हठात् आशीषदा के गले का स्वर रुद्ध हो जाता है। उस समय अनेक प्रयास करने के पश्चात् भी आशीषदा उस मन्तव्य को प्रकाश नहीं कर पाए। उन्हें उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानों जैसे किसी ने गले के भीतर शब्दों के धारा प्रवाह को अटका दिया हो। जितने समय तक वार्तालाप चलता रहा, उस अवधि तक लाख कोशिशों के बावजूद गले से स्वर नहीं निकला। आशीषदा चुपचाप बैठे-बैठे अगत्य समालोचना सुनने लगे। कुछ ऐसी अद्‌भुत घटना हुई कि समालोचना के शेष होने के पश्चात् जब सभी मास्टर महाशय के घर से बाहर निकले तब देखा गया कि आशीषदा पुन: स्वाभाविक भाव से बातचीत करने लगे! आशीषदा इस अप्रत्याशित घटना का कारण समझ नहीं पाए। लेकिन हठात् वाक्‌रुद्ध होने पर आशीषदा डरे नहीं कारण वे मन ही मन में समझ गए कि 'दादा की शायद इच्छा से ही यह हुआ है।' अगले दिन गुरुमहाराज के निकट जाने पर उन्होंने कहा, ''क्यो रे आशीष, मास्टर महाशय के गृह में गाना-बजाना सुना?'' आशीषदा आश्चर्यचकित हो गये, क्योंकि श्रीश्रीबाबा जानते नहीं थे कि उस दिन आशीषदा और सबलोग मास्टर महाशय के घर में गये थे। इससे यह स्पष्टतया समझा जा सकता है कि सन्तानों के आलाप-समालोचना के मध्य श्रीश्रीबाबा अदृश्य भाव से उपस्थित रहते हैं। *...क्रमश:*

–पितृचरणाश्रित श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिवपुर, हावड़ा
हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीचंद्र पारेख

उन्मेष

(१८)

बुद्धपूर्णिमा - (दिनांक - ९/०५/०९)

क्रियायोग साधना के सम्बन्ध में श्रीश्रीमाँ के वचनामृत – गतांक से आगे .....

फिर जब मेरा अभिषेक हुआ तो नांगाबाबा ने स्वयं अपने हाथों से व्यासपीठ में मेरा अभिषेक किया, तब मुझे विदित हुआ कि श्री श्री बाबाजी महाराज उसदिन क्यों मुझे देखने आये थे। आजतक ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ कि मैंने उन्हें परेशान किया हो, ऐसा भी नहीं है कि वे सर्वदा दिव्य देह लेकर आते है परन्तु विशेष-विशेष दिनों पर या अपने इच्छानुयायी उनके मंडल के कई महात्मा या उनके मंडल के अलावा भी अन्यान्य महात्माओं को भी लिंग शरीर में इस आश्रम के ऊपर के आकाश मंडल में प्रत्यक्ष घुमते हुए मैं बहुधा देखती हूँ। रोज तीन से चार जन एवं उनके संग श्रीश्रीबाबा भी, सभी लिंग शरीर में विचरण करते हैं, इसीलिए मुझे कभी किसी प्रकार की चिन्ता या भय नहीं होता। मन्दिर को सुचारु रूप से चलाने के लिए मुझे आजतक आश्रम के बाहर कदम नहीं रखना पड़ा। वे मेरे प्रत्यक्ष देवता हैं, उनपर ही मेरे जगत्-कल्याण के सारे कार्य निर्भर हैं अतएव आजतक इस विषय में मुझे कभी कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ी। समय के साथ-साथ आश्रम के कर्म अपने-आप ही उत्तरोत्तर वृद्धि पा रहे हैं। उनके सत्कर्म हेतु यदि कोई व्यक्ति, मुझे प्रेरण करता है तो असुविधा होने पर

वे स्वयं आकर सूचित कर देते है कि – 'एक व्यक्ति भगवान के कर्म हेतु आयेगा, अच्छा व्यक्ति है, उसे दीक्षा देना' इत्यादि।

महामुनि बाबाजी महाराज के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना जाता है। बाबाजी महाराज से मैं कुछ जिज्ञासा नही करती ऐसा नहीं है – 'तुम क्या वही व्यक्ति हो?' तो वे इशारे से हाँ या ना में उत्तर देते।

बाबाजी महाराज का एक और नाम है जो कई साधुओं को ज्ञात है एवं यह अत्यन्त गोपन नाम है। मेरे शिष्यों को भी वह पता नहीं है। सिर्फ सच्चे साधुओं को ही वह पता है। उस नाम से उन्हें तभी बुलाते हैं जब हमें कोई निजस्व वार्तालाप करनी होती है। महात्मा मंडल में इसीप्रकार सभी का एक अन्य विशिष्ट नाम होता है। मेरा भी एक नाम है। उस सम्मानजनक नाम से जब किसी को बुलाया जाता है तो वे समझ जाते हैं कि मुझसे कुछ प्रयोजन है और मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। जब मैंने उनसे पूछा कि बुद्ध पूर्णिमा का उद्यापन कैसे करना चाहिए तो उन्होंने बताया कि बुद्ध-पूर्णिमा के दिन उस क्रिया-साधना को सभी को करना चाहिए जिस गीता की साधना को मैं समग्र विश्व में प्रसार करने आया हूँ एवं समग्र मनुष्यों में प्रसारित करने आया हूँ जिसके माध्यम से वे पशुचेतना से उन्नत मानवचेतना में उत्तोलित हो सके। लाहिड़ी महाशय जब आये थे तो उनके साथ अनेक बड़े-बड़े महापुरुष आये थे, इसी क्रियायोग की साधना प्रदान करने हेतु। जो क्रियावान हैं, क्रियायोग साधना करते हैं वे सभी इस दिन अखंड महापीठ में साधना अवश्य करे, यह मेरा सभी से अनुरोध है। इसीसे बाबाजी महाराज संतुष्ट होते हैं। इसदिन अखंड महापीठ में जो साधना करेगा, उन प्रत्येक के कूटस्थ मध्य महामुनिजी की शक्ति विकसित अवश्य होगी। आज जिन्होंने क्रिया की है उन सभी के निश्चय ही कूटस्थ में आलोक एवं ज्योति का प्रकाश और तत्संग उपलब्धि अवश्य ही मिली है। *...क्रमशः*

(श्रीश्रीमाँ सर्वाणी द्वारा रचित बंगला ग्रंथ 'उन्मेष' से उद्धृत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली

श्री अमरेन्द्र चन्द्र श्याम की कृति 'अखण्ड महापीठ' द्वारा प्रकाशित भगवान श्रीश्री किशोरी मोहन का जीवन ग्रंथ 'वृहत् किशोरी भागवत्'। इसके अंतर्गत भगवान किशोरी मोहन के अमूल्य आध्यात्मिक उपदेश समृद्ध पत्रावली से निम्नलिखित पत्रों को उद्धृत किया गया है।

पत्र संख्या (५)

ॐ

प्रणवाश्रम, काशीधाम
२४ माघ, १३४५ बं

श्रीमान क्षितिश – परम् कल्याणीयेषु,

तुमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर दे रहा हूँ। यथा – जो ज्ञान और मुक्ति हेतु साधना करते हैं, उनका चाहे जिस किसी भी साधन द्वारा, चित्त शुद्ध होने पर वे चित्त को आत्मस्थ कर तदुपरांत आत्मा का कुछ-कुछ परिचय जान पाते हैं, तत्पश्चात् क्रमशः आत्मा को प्राप्त करते हैं। जिनका चित्त सत्व किंचित रजोगुण संयुक्त रहता है उन्हें ऐश्वर्य प्राप्ति की आकांक्षा होती है। तब वे देह के भिन्न स्थानों पर ध्यान समाधि कर भिन्न-भिन्न ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। यथा – कंठ कूप में ध्यान या समाधि के द्वारा क्षुधा-पिपासा आदि की निवृत्ति होती है। 'कंठ कूपे क्षुत् पिपासा निवृत्तिः'– योगदर्शन, विभूतिपाद। कंठ कूप के अधः कूर्म नाड़ी अवस्थित है। वहाँ ध्यान-समाधि द्वारा चित्त स्थैर्य प्राप्ति होती है। 'कूर्म्म नाड्यां स्थैर्यं'।

श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन

जो पंच स्थूल-भूत एवं सूक्ष्म-भूत में ध्यान समाधि का अभ्यास करते हैं उन्हें अभ्यासोपरांत ऐश्वर्यादि उपलब्ध होते हैं। समस्त ऐश्वर्य ही अविद्या के क्षेत्रस्थ हैं।

जो समस्त योगी – मूलाधार होते हुए क्रमान्वय ऊर्ध्वोत्तर

पद्मों में मनोनिवेशपूर्वक ध्यानाभ्यास करते है उनमें पहले ऐश्वर्य का उदय होता है। मूलाधार से कंठ पर्यन्त क्रमशः क्षिति, अप्, तेज, मरूत, व्योम, स्थूल एवं सूक्ष्म भूतों का स्थान है। स्थूल एवं सूक्ष्म भूतों को आयत्ताधीन करने पर ऐश्वर्य का उदय होता है। ऐश्वर्य प्राप्ति के मूल में ऐश्वर्य की आकांक्षा है। जो ज्ञानाकांक्षी अपनी चित्त शुद्धि कर उस चित्त को आत्मा में स्थित करते हैं। चित्त सत्त्व रजगुण संपन्न होकर ऐश्वर्य प्रकाश तथा सत्वत्व एवं आत्मस्थ होने पर आत्म प्रकाश। ज्ञानप्रकाश से पूर्व ऐश्वर्य प्रकाश होने पर चित्त प्रलुब्ध होकर उस क्षेत्र में धावित होता है एवं ऐश्वर्य लाभ कर उसे यथेष्ठ लाभ हुआ इसकी कल्पना करता है। बाद में यदि उसका ज्ञानोदय होता है, तब ऐश्वर्य उसे हेय अथवा तुच्छ लगता है। उन सभी ऐश्वर्यों के संबंध में पतंजलि के विचार हैं कि वे ज्ञानोदय के प्रतिबंधक हैं। इसका कारण है कि समस्त ऐश्वर्यों की गति आत्मा के बहिस्थ एवं ज्ञान की गति आत्मस्थ। अतएव मुक्तिकामी साधकों को उस विषय में सतर्क करना उचित है। ऐश्वर्य को केवल ध्यान-समाधि द्वारा ही उपलब्ध किया जा सकता ऐसा नहीं है, अन्यान्य उपाय द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता हैं। योग दर्शन के कैवल्यपाद के प्रथम सूत्र में वर्णित है –

'*जन्मौषधि मंत्रतपः समाधिजा सिद्धयः।*'

इसका अर्थ – जन्म, औषधि, मंत्र, तपस्या और समाधि इनमें से प्रत्येक से सिद्धि या ऐश्वर्य का उदय होता है। जन्म से किस प्रकार उपलब्ध होता है, ऐश्वर्य? किसी ने पूर्व जन्म में ऐश्वर्य हेतु साधन सम्पन्न किया था किन्तु दैहिक या मानसिक प्रतिबंधक वश ऐश्वर्य का उदय नहीं हुआ, परवर्ती जन्म में उन सभी प्रतिबंधक के न रहने पर उस जन्म में बिना साधन किए ऐश्वर्य का उदय होता है। इसे जन्मगत सिद्धि कहते हैं।

उसके बाद है औषधि – द्रव्यगुण द्वारा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। किसी वृक्ष का मूल शरीर पर धारण करने से, भोजन अथवा मुख में रखने से ऐश्वर्य का उदय होता है। इसी प्रकार मणि-रत्न आदि धारण करने से भी ऐश्वर्य प्राप्ति होती है।

इसके बाद मंत्र – विशेष-विशेष मंत्र जप द्वारा एक एक तरह के ऐश्वर्य प्राप्त होते है। बिना ध्यान समाधि से भी इन समस्त मंत्रों द्वारा ऐश्वर्य का उदय होता है।

इसके बाद तपः या तपस्या द्वारा भी होता है। शारीरिक कष्टसाध्य शास्त्रोक्त आचरण द्वारा भी ऐश्वर्य की उपलब्धि होती है। भिन्न-भिन्न मंत्रों से अलग-अलग प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसके बाद समाधि द्वारा भी होती है। समाधि द्वारा ध्यान और समाधि उभय ही सूचित होते हैं। इसके संबंध में पूर्व में ही कथित है।

समग्र ऐश्वर्य के उदय होने के उपरांत भी ज्ञानोदय नहीं भी हो सकता है। ज्ञानोदय के पूर्व समस्त ऐश्वर्यों का उदय वांछित नहीं है किन्तु कुछ-कुछ ऐश्वर्य का उदय प्रायः सभी के शरीरों में होता है।

ज्ञानोदय के पश्चात् ऐश्वर्य की आकांक्षा नहीं रहती है। आकांक्षा यदि होती हैं तब वे उसे प्राप्त कर लेते हैं। किन्तु प्रायः ऐसी आकांक्षा रहती नहीं है। मृत्योपरांत जीव ईश्वर के समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा स्वभावतः निर्गुण किन्तु माया के संयोग से उनका ईश्वरत्व होता है। इसीलिए श्रुति में एवं अन्यान्य शास्त्रों में परमात्मा का निर्गुणत्व एवं सगुणत्व उभय रूपत्व ही वर्णित है। जीव भी विदेह मुक्त होकर परमात्मा का सगुणत्व एवं निर्गुणत्व उभय रूपत्व प्राप्त कर लेता है। जगत् का एकमात्र आत्मा, वही परमात्मा। (इस अवस्था के संबंध में आचार्यगणों के मध्य मतभेद है।) वे कभी-कभी सूक्ष्म देह धारणकर उपदेशादि द्वारा जगत् का कल्याण करते रहते हैं। मेरे मतानुसार - वे परमात्मा से एकत्व होकर तदनुयायी क्रिया करते हैं। उनके कार्य कलाप भगवत् लीलान्तर्गत। एकाग्रता प्रयुक्त परमात्मा सहित उनके संकल्प में विरोध नहीं रहता। अतएव ऐकमेवाद्वितीयम्। समस्त विचारों के मध्य यह महान श्रुतिवाक्य स्मरण रखना उचित है। देह का अस्तित्व रहते हुए यदि अभेदभाव उद्भासित होता है देहांत के बाद उनके अविद्या के समूल नाश द्वारा और गंभीर एवं स्थिरतर होने की ही बात है। अतएव एकमेवाद्वितीयम्। केवल ऐश्वर्य लाभ से मुक्तिलाभ नहीं होती है। ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। मैंने तुमसे संक्षेप में इस विषय को बताया है।

इति–

श्रीकिशोरी मोहन

–हिन्दी अनुवादः **मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द**

ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर

योग व्याख्या - श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीश्री सर्वाणीमाँ को विशेष अनुरोध – वे यदि ड: गोपीनाथ कविराजजी के १८ पत्रके साधन मार्ग के निगूढ़ तत्त्व एवं साधन प्रणाली के ऊपर आलोकपात एवं व्याख्या हिरण्यगर्भ पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित करे तो यह एक अमूल्य सम्पद हो जाएगी। परवर्तीकाल में इसे एक पुस्तक का रूप दिया जा सकता है।

–विजन कुमार सेनगुप्त

ड: गोपीनाथ कविराजजी के पत्रावली प्रसंग पर :–

मर्मी साधक ड: गोपीनाथ कविराजजी के गुरुभ्राता श्रीअक्षय कुमार दत्तगुप्त महाशय को ज्ञानगंज के साधनमार्ग के क्रियायोग के जो समस्त निगूढ़ तत्त्व, तथ्य एवं साधन प्रणाली के विषय पत्रों में उल्लेख किये गये हैं उनसे ही संबंधित कुछ प्रश्न :–

६। पत्र (७) - (प्रथम भाग) महाकुण्डल तत्त्व क्या है? प्रकृति का रहस्य किस प्रकार उन्मोचित होता है?

'१०८ योग क्रियाओं में प्रथम १०० कर्म स्तर के अंतर्गत' – ये सारे कर्म स्तर क्या-क्या है? (इसकी व्याख्या)

'१०८ योग क्रियायों में १००वीं या अंतिम क्रिया समष्टि द्योतक' – (इसकी व्याख्या)

'उसके परवर्ती १०१ से १०८ परवर्ती अवस्था के द्योतक। इसमें १०१– बोध, १०२ - ज्ञान, १०३ - भाव, १०४ - गुण, १०५ –महाभाव, १०६ - महाज्ञान, १०७ - महागुण' - इन योगावस्थाओं का अनुभव एवं ज्ञान की व्याख्या।

उत्तर - (प्रथम भाग) – महाकुंडल तत्त्व एवं प्रकृति-रहस्य के विषय में पूर्वोक्त प्रश्न के उत्तर में वर्णन किया गया है।

चिद्राज्य में प्रवेशाधिकार होने पर योगी की बोधि में प्रकृति-रहस्य स्वप्रकाशित भाव में उन्मोचित होता है। अनन्त ज्योति स्वरूप पूर्णब्रह्म चेतना में योगी का बोध गुणातीत अवस्था में उपनीत होकर महागुणमय योगमाया एवं उसके संबंधित महागुणहीन घना अंधकार अलख ब्रह्मरूप अनंत अखंड परमब्रह्म रूप के बोध की उपलब्धि करने में सक्षम होता है। वही विशुद्ध जड़ रूप सत् - इसके मध्य जब योगी का बोध निमज्जित होता है, तब उसी सत् की भूमि पर चित् का स्पंदन जब स्वप्रकाशित भाव में उत्थित होता है उसी समय योगी पुन: स्वअस्तित्व बोध में लौट आते हैं एवं पुन: महागुणमय ज्योति:ब्रह्म की उपलब्धि करते हुए सत्, चित्, आनन्द की क्रमानुयायी भूमि में अवगाहन करने में सक्षम होते हैं एवं क्रमश: उसी अवस्था में अधिक क्षण विचरण करते-करते महागुणमय सगुण ब्रह्म एवं महागुणहीन निर्गुण ब्रह्म का महा महाज्ञान आहरण कर सकते हैं। वही सगुणब्रह्ममय महागुणमय अवस्था ही हुआ योगमाया द्वारा परिचालित दिव्य जगत्, नित्य जगत्। यही पर महाभाव परिपुष्टिलाभकर उसके परवर्ती पुरुषोत्तम परमभाव का उद्रेक करते हैं योगी आत्मसत्ता के बोध में। इसीलिए कहा गया है १०८ स्वतंत्र, जो पुरुषोत्तम भाव का निर्देशक। १०८ - यहीं योगी का पूर्ण स्वातंत्र्य रूपी चिद् साम्राज्य में प्रतिष्ठा होता है। १०७ - में महागुण परमसाम्यावस्था प्राप्त कर १०८ में पुरुषोत्तम अवस्था की बोध चेतना को प्रकाशित करता रहता है। बिना महायोगीश्वर के उन सभी स्तरों को कोई पार नहीं कर सकता है। १०७ में परमसाम्यावस्था में उपनीत होकर योगीश्वरगण भेदाभेदभाव रहित होकर पूर्ण अद्वैत परमब्रह्म स्वरूप में अवस्थान करने में सक्षम होते हैं। तत्पश्चात् अद्वैत एवं द्वैत इन उभयभाव में योगीश्वर चिद् राज्य में चिद् साम्राज्य की स्थापना करने में सक्षम होते हैं। इस समय महाकुण्डल तंत्रयोग की आवश्यकता का योगीश्वर अनुभव करते हैं। क्योंकि महाकुण्डल तंत्रयोग कौशल अवलंबन बिना सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप महाशून्य वक्ष पर चिद् राज्य की स्थापना संभव नहीं है एवं महाकुण्डल के बिना वहाँ से बाहर आने के पथ का संधान पाना भी दुरूह कार्य है। – योगीश्वर चिदाकाश में निज उड्डीन सत्ता के साथ विराजमान रहते हैं। महाशून्य में राज्य स्थापित कर उसका अधिष्ठाता होना ही महायोगीश्वर का लक्ष्य होता है। परमब्रह्म प्रकृति के रहस्य से परिपूर्ण भाव में अवगत होने के पश्चात् ही महायोगीश्वर

ड: गोपीनाथ कविराज

चैतन्यमय शून्य वक्ष पर अवस्थान करने में सक्षम होते हैं।

'१०८ योगक्रियाओं में प्रथम १०० कर्मस्तर के अंतर्गत हैं'; ये समस्त कर्मस्तर स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण चेतना को अवलंबन कर साधित होते हैं। पतंजलि के योग-साधन कौशल इसी कर्मस्तर के अंतर्गत हैं। ये सब अतीव गुप्त एवं सद्गुरु वक्त्रगम्य; इन सारे कौशलों को ब्रह्मविद्या के रूप में ही ऋषि-मुनिगणों ने चिह्नित किया है। इस आत्मकर्म संवलित योगविद्या रूपी कौशल के मध्य हठयोग आदि ८४ प्रकार के आसन ग्रथित है; ये ८४ तरह के आसन जगत् में सामान्य जन के समीप व्यक्त हुए हैं किन्तु अन्य २४ प्रकार के आसन गुरुवक्त्रगम्य हैं एवं गुप्तभाव में रक्षित हैं। उन समस्त गुप्त २४ प्रकार के आसनों में रुद्रासन, मणिपुर आसन, गुप्तवीरासन, गुप्तवज्रासन इत्यादि आसनादि हैं। इन सभी आसनों के विज्ञान एवं स्वरूप को सद्गुरुमुख से अवगत कर अपनी उपलब्धि अनुभूति की सहायता से ज्ञानगम्य करना पड़ता है। आत्मसत्ता का प्रत्येक 'आसन' साधना स्थूल, सूक्ष्म, कारण चेतना के देह में प्राण की समरस्यता प्रदान करता है। फलस्वरूप योगी साधक के आधार में हर तंत्री में मलमुक्त होकर देहाभ्यंतरस्थ नाड़ियाँ शोधित हो जाती हैं। जिससे योगी का आसन शुद्धि, भूतशुद्धि, आधार शुद्धिकरण संपन्न होता है। परिणामस्वरूप योगी की चेतना ज्योतिष्मती अवस्था में अवस्थान कर आत्मज्योति के आलोक से उद्भासित होकर प्रज्ञा-ज्योति में स्नात होती है। तब प्रत्याहार,धारणा एवं ध्यानावस्था में योगी सिद्ध हो जाते हैं। जितने क्षण तक ध्यान होता है उतने क्षण तक कर्म; अंतर के अंतर में गभीर गहन में इस प्रकार मानसभूमि पर चेतना की सहायता से योग कौशल में योगी क्रमशः आत्म-उपलब्धि की भूमि पर स्थिर प्राण के क्षेत्र में उपनीत होकर आत्मतत्त्व का ज्ञान आहरण करने में सक्षम होते हैं। यह समस्त विषय परावस्था के अंतर्गत हैं। आत्मबिंदु में ही योगी का 'एक' या 'एकशत' पूर्ण होता है। क्योंकि आत्मज्ञान ही ब्रह्मज्ञान। योगसाधना के कर्मस्तर प्रधानतः तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान के अंतर्गत हैं। १०० वीं संख्या या कर्मस्तर की अंतिम क्रिया ही व्यष्टि चेतना अर्थात् निज सत्ता के घट स्थित सीमित चेतना एवं समष्टि चेतना का तात्पर्य विश्व-चेतना ससीम से असीम की ओर धावित होती है। कर्मस्तर की उन्नत अवस्था में योगी को अनुभूति की सूचना मिलती है इस अनुभूति-बोध से परिणत होती है समाधि-सूचना। समाधि की व्याख्या पतंजलि योग में खूब स्पष्ट भाव में वर्णित है। समष्टि चेतना के प्रकाश से ही बोध चेतना जाग्रत होती है। स्थिर बुद्धि से ही बोध अवस्था विकसित होकर प्रज्ञा में पर्यवसित होती है। यह स्थिर बुद्धि हुई मेधाशक्ति। इसी कारण कहा गया है १०१ में बोध, १०२ में ज्ञान, १०३ में भाव, १०४ में गुण, १०५ में महाभाव, १०६ में महाज्ञान, १०७ में महागुण। निर्मल चित्ताकाश में शुद्ध चित्त में जो समस्त विषय आत्मबोध के मध्य से उपलब्धित होते हैं उसे ही 'बोध' कहा गया है। गोपीनाथ कविराजजी की भाषा में, ''बोध का तात्पर्य 'एक महासत्ता का आभास चैतन्य मात्र प्रकट', यही समझना होगा।'' आत्मसत्ता के वक्ष पर बोध जागृत होने पर तब स्वतः ज्ञान का विकास होता है। इसीलिए 'बोध' १०१ और ज्ञान १०२; ज्ञान जितना ही निर्मल होता है उतना ही योगी प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होते हैं। 'बोध' अवस्था के पश्चात् ज्ञान का आगमन होता है क्योंकि प्रगाढ़ ध्यान के भीतर ही समाधि की सूचना मिलती है। बोध की परिपक्वावस्था ही ज्ञान। ज्ञान का परिपक्वावस्था ही हुआ भाव अर्थात् विशुद्ध भाव। विशुद्धभाव सत्ता के तीन गुण अर्थात् सत्त्व, रजः एवं तमः, इन त्रिगुण को विशुद्ध स्तर में ले जाता है। त्रिगुण की विशुद्धता प्राप्त होने पर समाधि-अवस्था में योगी शिवावस्था प्राप्त करते है। यही साधन स्तर की सप्तम भूमि। १०५ में शिवावस्था में योगी के हृदय में महाभाव का संचार होता है; इस अवस्था में योगी विश्व का पूर्णज्ञान अर्जन कर शिवस्वरूप हो जाते हैं। तत्पश्चात् महाभाव के स्फूरण से महाज्ञान का प्रकाश योगी सत्ता में आने लगता है। महाभाव की अधिकता से योगीश्वर तब अष्टम भूमि पर आरोहण करने में सक्षम होकर महाज्ञान १०६ के आलोक से आलोकित होते हैं एवं तब नवम् भूमि पर पहुँचकर योगी होते हैं परमशिव। परमशिव अखंड अनंत महाज्ञान के अधिकारी होते हैं। १०७ में पहुँचकर तब समाधि से व्युत्थानावस्था लाभ कर योगीश्वर निर्गुण-सगुण रूप महागुण संबंध में परमबोधि से परमज्ञान की भूमि पर उपनीत होते है। परमशिवावस्था के इस स्तर को 'नवमुंडी' महाआसन कहा जाता है। सप्तम भूमि (१०५) से ही महाकुंडल चक्र की रचना आरंभ हो जाती है।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

श्रीश्रीमाँ की प्रथम बद्रीनाथधाम यात्रा

(४)

वर्ष २००९ इलाहाबाद के प्रयाग क्षेत्र के यमुना नदी के तट पर अवस्थित अरेल में सच्चाबाबा का आश्रम के महन्त श्रीगोपालजी के साथ उनके ऋषीकेश आश्रम के महन्त जी ने हमारे आश्रम में प्रथमबार पदार्पण किया। यहाँ आकर उन्होंने गुरुमहाराजगणों के प्रतिष्ठित आसन का दर्शन किया, श्रीश्रीमाँ के साथ कुछ समय सत्संग में अतिवाहित कर सम्पूर्ण आश्रम का विधिवत् परिदर्शन किया। यहाँ से प्रस्थान करते हुए उन्होंने श्रीश्रीमाँ से उनकी चरण रज उनके दोनों आश्रमों में पड़ सके इसलिए पधारने का आग्रह किया। भक्तों का प्रेमपूर्ण आग्रह का मान रखते हुए श्रीश्रीमाँ ने ऋषीकेश भ्रमण के समय वहाँ जाने की इच्छा प्रकट की। कुछ सामान्य सी असुविधा के पश्चात् हम लोग श्रीश्रीमाँ को लेकर सच्चाबाबा के आश्रम में पहुँच ही गए। वहाँ पहुँचकर हमें पता चला कि महन्त परमहंसजी ने कुछ दिन पूर्व ही अपनी नश्वर देह का त्याग किया है। हम सभी इस अति संवेदनशील एवं असहनीय संवाद से अनजान थे अत: कुछेक भक्तों के साथ उनकी वेदी पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अतिवृष्टि के कारण श्रीश्रीमाँ आश्रम में जा न सकी। उनका एक आश्रम वृंदावन बिहारी की चरण छाया में पुण्यतमा सलीला प्रयाग के यमुना नदी के तट पर, अन्य एक और आश्रम जिसका हमने इस बार दर्शन किया गंगोत्री के हिमशैल द्वारा सृष्ट, गोमुख के उत्स से प्रवाहित अति पुण्यसलिला गंगा के किनारे अवस्थित है। इस आश्रम का परिवेश अति मनोरम था। आधुनिक साधनों से युक्त यह आश्रम तपोस्थली ऋषीकेश में होने के उपरांत भी ऐसा लगा जैसे वहाँ से यथार्थ साधना कहीं लुप्त हो गयी है। सेवामूलक कर्म, शिक्षा व्यवस्था, धर्मप्रचार के साथ-साथ साधु-सन्तों के मध्य प्रकृत साधना का प्रयोजन और आग्रह रहना अति अवश्य है जिसका वहाँ अभाव था। हमारे द्वारा श्रीश्रीमाँ का परिचय जानने के पश्चात् आश्रमस्थ कई शिष्यों और भक्तों ने श्रीश्रीमाँ को सश्रद्ध प्रणाम निवेदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। थोड़े समय पश्चात् और देरी न करते हुए हमलोग 'रामकृपालु महाराज जी' के आश्रम की ओर अग्रसरित हुए।

वर्ष २००९ जनवरी महीने में गुरुमहाराजगण के विग्रह प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर रामकृपालुजी महाराज श्रीश्रीमाँ के विशेष आमंत्रण पर हमारे आश्रम में पधारे थे। उसी समय उन्होंने श्रीश्रीमाँ को ऋषीकेश आश्रम में पदार्पण करने के लिए सविनय अनुरोध किया। श्रीश्रीमाँ उनके आमंत्रण को ठुकरा न सकी और उसी वर्ष श्रीश्रीमाँ हम सभी को उनके आश्रम में ले गयी। तत्पश्चात् पुन: हमलोग बद्रीनाथधाम में जाने के पूर्व दिन उनके 'भरतमिलाप' आश्रम में गए। तीनमंजिला यह विशिष्ट आश्रम भी गंगा नदी के पास था। श्रीश्रीमाँ के आगमन की सूचना पाकर ही महाराजजी आनन्दातिरेक से अपने भावों पर नियंत्रण न रख सके और बीच पथ में श्रीश्रीमाँ को सम्वर्धना प्रकट करने के लिए खड़े हो गये। वे माँ को लेकर आश्रम में गये और यथोचित आदर के साथ आसन ग्रहण करवाया। हम सभी ने महाराज जी को प्रणाम निवेदन किया। पूर्व में हम लोग जिस समय श्रीश्रीमाँ के साथ उनके आश्रम में गये थे, उसी समय उन्होंने हमारी परमश्रद्धेय श्रीश्रीमाँ से योगदीक्षा प्राप्त की थी। उनके साथ साथ उनके एक विदेशी शिष्य (देवरामजी) को भी श्रीश्रीमाँ ने योगदीक्षा प्रदान की थी। इस आश्रम की पूर्व परिचिता साध्वीजी ने श्रीश्रीमाँ का वरण किया एवं प्रणाम ज्ञापित कर भीतर चली गयी हमारे नाश्ते की व्यवस्था करने के लिए। हमारी क्षुधाशांति की व्यवस्था हेतु साध्वीजी अति तत्परता से तैयारी करने लगी। इन साध्वीजी ने महाराज जी से ही सन्यास प्राप्त किया था। आश्रम के कुछ भक्तों एवं हमलोगों ने श्रीश्रीमाँ के सान्निध्य में कुछ समय व्यतीत किया। विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक समालोचना, साधु-सन्त

विषयक चर्चा, हिमालय का वातावरण, पथ की परिस्थिति, वहाँ स्थित अनेक आश्रमों की व्यवस्था, महाराज के देश-विदेश की भ्रमण चर्चा, इसके साथ-साथ श्रीश्रीमाँ के श्रीश्रीबद्रीनाथधाम में जाने के मूल उद्देश्य का भी सत्संग में जिक्र हुआ। श्रीश्रीमाँ ने जोगेश्वर के १२० वर्ष के महात्मा श्रीश्रीप्रकाशानंदजी की शारीरिक और अन्य समस्त प्रकार की कुशल-क्षेम की जानकारी प्राप्त की। तब महाराजजी ने माँ को अवगत करवाया कि ''महात्माजी तो वहीं है अर्थात् जोगेश्वर के मोक्षधाम में ही है किन्तु मार्ग में अनेक अवरोध के कारण वहाँ जाना उचित नहीं है। बद्रीनाथ की ओर जाने वाला मार्ग भी ठीक नहीं है। लेकिन तुम स्वयं जा रही हो, अत: यहाँ मेरे बोलने का कुछ नहीं है।'' उन्होंने तो अपने गंगा तट पर अवस्थित आश्रम में हम लोगों के रहने की व्यवस्था सम्पूर्ण रूप से कर दी थी। लेकिन हम लोगों से हरिद्वार में हरिदासधाम की धर्मशाला में सब प्रकार की व्यवस्था की बात सुनकर, वे कुछ शान्त और आश्वस्त हुए, बद्रीनाथधाम से लौटने के समय उनके आश्रम में रात्रिवास के लिए श्रीश्रीमाँ से सविनय अनुरोध किया। तब श्रीश्रीमाँ ने उन्हें कहा, ''पहले तो बद्रीनाथ से मूल उद्देश्य साधन करके आऊँ, तत्पश्चात् बताऊँगी।'' महाराजजी द्वारा व्यवस्था किए गए खाद्यान्न का हमने बड़े आनन्द से उपभोग किया और आश्रम में नवनिर्मित तीसरी-मंजिल को देखा। गंगा नदी के तट पर आकर प्राकृतिक सौन्दर्य का रसपान कर अपने नयनों को शीतल किया। श्रीश्रीमाँ भी हम लेगों के साथ वहाँ कुछ देर थी। गंगानदी के निकटवर्ती पर्वत की मनोरम शोभा और स्रोतवाहिनी गंगा की लहरों का अपूर्व दृश्य बहुत मनोहारी था। आहिस्ता-आहिस्ता संध्या हो रही थी, आश्रम में प्रार्थना, ध्यान और जप का समय हो रहा था, अत: हम लोग श्रीश्रीमाँ के साथ रामकृपालुजी के आश्रम से प्रस्थान कर हरिद्वार के सच्चिदानन्दजी और गीता भाभी के गृह में गए। वहाँ कुछ देर विश्राम कर हल्का जलपान ग्रहण कर हरिदासधाम में लौट गये। श्रीश्रीमाँ के साथ परवर्ती दिन से हम लेगों की बद्रीनाथ धाम यात्रा का शुभारम्भ होने वाला था। *...क्रमश:*

–मातृचरणाश्रित स्वामी संवेदानंदजी

हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

गुरुगीता

(मूल अन्वय, बंगानुवाद व यौगिक और साधारण अर्थ सम्मिलित)

योगीराज श्रीहरिमोहन बन्द्योपाध्याय

(१४)

ध्यानमूलं गुरोर्मूर्त्ति: पूजामूलं गुरो:पदम्।
मंत्रमूलं गुरोर्व्वाक्यं मोक्षमूलम् गुरो: कृपा।। ४८

–गुरो: मूर्त्ति: ध्यानमूलं, गुरो: पदम् पूजामूलम्, गुरो: वाक्यं मंत्रमूलम्, गुरो: कृपा मोक्षमूलम्।। ४८।।

कूटस्थ पद में प्रकाशित गुरु का रूप, वही गुरुभाव प्राप्ति के उद्देश्य से ध्यान के मूल स्वरूप; हंसरूप गुरुपद की पूजा (अर्थात् वायु साधन रूपी क्रिया) वही पूजा का मूल है (अर्थात् गुरुप्राप्ति के उद्देश्य से तत्साधन हेतु पूजा की व्यवस्था हो रही है); गुरु का वाक्य (अर्थात् ॐकार रूपी जप क्रिया जो गुरु प्रदत्त है) वही जप का मूल है; एवं सर्वप्रकार के साधनों के अंत में गुरु की कृपा होती है, अर्थात् तब शिष्य समस्त शक्ति को गुरु को अर्पण करता है एवं अहं भाव से निजस्व कुछ न कहकर, गुरु कृपा के रूप में सब कुछ घटित हो रहा है तभी जीव मुक्त कहकर जाना जाता है। जगत् संपर्क अहं के बोध में निजस्व की धारणा होती है, वह जब विलुप्त होती है तभी जीव-सत्ता लुप्त होती है, जगत् संपर्क भी निरुद्ध हो जाता – जीव मुक्त हो जाता है।। ४८

सप्तसागर पर्यन्त तीर्थस्नानादिकै: फलम्।
गुरोरंघ्रि जलं विन्दुं सहस्रांशेन दुर्लभम्।। ४९
सप्तसागर पर्यन्तं तीर्थस्थानादि कै: यत् फलम् (निर्दिष्टं तस्मात्) गुरोरंघ्रि संभूतं विन्दु मात्रं जलम् (तुलनया) सहस्रांशेन दुर्लभम् (विद्धि)।। ४९

ब्रह्मपद नि:सृत विन्दु मात्र जलसेवन से (अमृत विन्दु पानी) जो फल प्राप्त होता है, उसका सहस्रांश का एकांश फल भी सप्त सागर पर्यन्त तीर्थ स्नानादि द्वारा नहीं होता (क्योंकि ब्रह्मचर्य ही परम तीर्थ कहकर उद्दृत है। यथा – ब्रह्मचर्य परम् तीर्थम्, इति काशी खंड:। उत्पत्ति स्थान ही परम् तीर्थ है, ब्रह्म ही जीव का उत्पत्ति स्थान है इसीलिए ब्रह्मचर्य ही परमतीर्थ के रूप में ज्ञात है)।। ४९

गुरु पादोदक – अर्थात् क्रियाकाल में हंसरूप गुरुपद की पूजा से जो आनंद रस अनुभूत होता है, वही है गुरुपादोदक।

अर्थात् क्रिया के अंत में क्रिया की परावस्था में जो शांतिरस अनुभूत होता है उसी को गुरुपादोदक कहा जाता है। कूटस्थ ब्रह्म ही परब्रह्म का पदस्वरूप, एवं हंस कूटस्थ ब्रह्म का पद। कूटस्थ ब्रह्म एवं परब्रह्म में कोई प्रभेद नहीं है वे दोनों अभेद ही है। यथा – (जन प्रथम अः प्रथम श्लोक देखो; In the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was God.!) (अर्थात्, प्रारंभ में शब्द था, शब्द ब्रह्म के साथ था, और शब्द ही ब्रह्म था)।

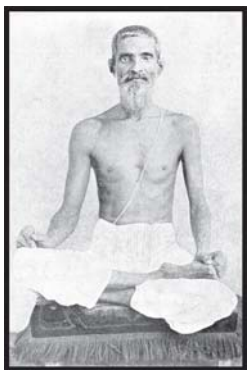

गुरुरेव जगत् सर्वं ब्रह्माविष्णुशिवात्मकं।
गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् संपूजयेत् गुरुम्।। ५०
ब्रह्माविष्णु शिवात्मकं सर्वम् जगत् गुरुरेव, गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् गुरुं संपूजयेत्।। ५०

ब्रह्मा सृष्टिकर्ता के रूप में सृजन कर रहे है, विष्णु पालन कर्ता के रूप में सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं एवं शिव-रूप में सृष्टि का संहार हो रहा है; इन देवत्रय द्वारा सृष्ट जगत् का कार्य संपादित हो रहा है, परन्तु ये सब कौन हैं? ये सब उन्हीं के स्वरूप में जगत् में अवतीर्ण हुए हैं एवं कर्मशून्य देव होते हुए भी वे सब देवता के रूप में अवतीर्ण होकर कर्म संपादित कर रहें है। परन्तु मूल कारण हैं वही रूपातीत सूक्ष्म ब्रह्म एवं ब्रह्म बिना उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसीकारण अक्षर-ब्रह्म का स्वरूप कूटस्थ-ब्रह्म ही एकमात्र पूजनीय है।

ज्ञानम् बिना मुक्तिपदं लभते गुरुभक्तितः।
गुरोः परतरो नास्ति ध्यायोहसौ गुरुमार्गिना।।
५१
ज्ञानम् बिना गुरुभक्तितः मुक्तिपदं लभते,
गुरो परतरं नास्ति, (अतएव) गुरुमार्गिना
असौ (गुरुरेव) ध्येयः।।५१

एकमात्र गुरु में अवस्थिति द्वारा ज्ञानलाभ होता है, क्योंकि गुरु ही ज्ञान के स्वरूप हैं, इसीलिए अन्यभाव से ज्ञान-लाभ की चेष्टा न कर एकमात्र गुरुभक्ति द्वारा एकांत भाव में गुरु में अवस्थिति द्वारा मुक्तिपद पाया जा सकता है। इसीलिए गुरु पथावलंबियों के एकमात्र गुरु-ध्यान ही विधेय, क्योंकि गुरु से अधिक और कुछ नहीं।। ५१ *...क्रमशः*

(*कलकत्ता आदिनाथ-आश्रम के सौजन्य से प्राप्त*)

हिन्दी अनुवाद – श्रीश्रीमा सर्वाणी

पुराण कथा

देवराज शतक्रतु

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

देवराज इन्द्र ने अनेक देवताओं की सहायता से असुरों को पराजित करने के पश्चात् क्रमशः एकशत अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। इसके फलस्वरूप वे 'शतक्रतु' नाम से आख्यात हुए।

एकबार शुक्र, अंगिरा, कवि, अगस्त्य, नारद, पर्वत, भृगु, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, गालब, अष्टावक्र और भरद्वाज प्रभृति महर्षिगण वशिष्ठ पत्नी अरुन्धती, बालखिल्य मुनिगण एवं शिबि, दिलीप, नहुष, पुरु, अम्बरीष, ययाति, धुन्धुमार प्रभृति राजर्षिगण शतक्रतु के साथ प्रभास तीर्थ में उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने मंत्रणा की कि पर्यटन करते-करते माधी पूर्णिमा की तिथि को वे सभी कौशिक तीर्थ में समागत होंगे। इसके पश्चात् वहाँ के ब्रह्मसर नामक पवित्र सरोवर में अवगाहन कर सरोवर में प्रस्फुटित मृणाल समूह उत्पाटन कर भक्षण करने लगे। उनमें से महर्षि अगस्त्य ने कुछ मृणाल उद्धार कर तट पर रखे, वे समस्त सहसा अन्तर्हित हो गये। अनेक आलोचना समालोचना के पश्चात् भी मृणाल किसने अपहरण किये हैं इसका जब निर्णय नहीं हुआ तो, सभी शपथ लेकर अपनी-अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करने की चेष्टा करने लगे। सभी के शपथ लेने के पश्चात् शतक्रतु ने शपथ ग्रहण हेतु छल का सहारा लेते हुए कहा, ''जिसने महर्षि अगस्त्य के मृणाल लिए है वह चरित-व्रतचर्य यजुर्वेदी या सामवेदी ब्राह्मण को कन्यादान, अथर्ववेद का अध्ययन कर स्नान, समुदय वेद अध्ययन का पुण्य संचय, धर्मानुष्ठान और ब्रह्मलोक को प्राप्त हो।'' शतक्रतु को इस प्रकार शपथ लेते हुए देखकर महर्षिगण ने कहा, ''चूँकि तुमने शपथ लेते हुए छल से अपने मंगल की ही कामना की है अतएव तुमने ही महर्षि के मृणाल का हरण किया है।'' तब शतक्रतु ने कहा कि उसने

लोभवश महर्षि के मृणाल नहीं लिए है। महर्षियों द्वारा धर्मकथा श्रवण करने के लिए ही उसने इस उपाय का अवलम्बन किया है, अत: महर्षि, कृपा कर उसके अपराध क्षमा करे। शतक्रतु के सुभावों से प्रभावित महर्षि अगस्त्य ने उसके अपराधों को क्षमा कर अपने मृणाल ग्रहण किए।

उपर्युक्त सत्यघटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साधरणत: सभी अपने स्वार्थजनित लाभार्थ ही कर्म करने के इच्छुक होते है। अपने लाभ की चिन्ता करके दूसरे को असुविधा प्रदान करना या क्षति करना कभी भी उचित नहीं है। जो निष्कामभाव से भगवान को प्रेम करता है, वह यथार्थ में भगवान का सेवक होता है। साधारणत: जो स्वयं के लाभ-हानि की चिन्ता न कर परोपकार करते हैं वे ही पुण्य संचित कर पाते है। उपर्युक्त कहानी के परिप्रेक्ष्य में देवराज ने भी धर्म उपदेश के लाभार्थ ही अगस्त्य के मृणाल का अपहरण किया था। इसीलिए ऋषियों से क्षमा-दान मिला । धर्म-उपदेश सात्विक शिक्षा विशेष, अतएव ऋषियों ने देवराज को क्षमा कर आशीर्वाद दिया, ''शतक्रतु को ब्रह्मलोक प्राप्त हो।''

(*सहायक ग्रन्थ - महाभारत, अनुशासन पर्व*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला

श्री विष्णुपद सिद्धान्त ठाकुर

(३०)

गतांक से आगे–

श्रीरामकृष्णदेव - (नरेन की जिज्ञासा सुनकर) ''सही तो है, तुमने तो मुझे असमंजस में डाल दिया, माँ से पूछकर देखता

हूँ, कभी-कभी तुम ऐसे अजीब सा प्रश्न पूछते हो कि मैं कुछ भी समझ नहीं पाता और तब माँ से कहता हूँ, कि तुमने मेरे जैसे ऐसे अनपढ़ व्यक्ति को कैसे अपनाया है? इस भौतिक जगत् के माता-पिता तो ऐसे पुत्रों से सदैव दु:खी रहते हैं पर जगत्माता तो बिल्कुल विपरीत दिखती हैं। माँ की लीला अद्भुत है। सुनो नरेन, माँ कह रही हैं कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उपनिषद् में है – सृष्टि, सृष्ट पदार्थ एवं सृष्टि-कर्ता, सभी कुछ ब्रह्म या विश्व-प्रकृति है। इस विश्व-प्रकृति को ही एक नाम दिया गया है 'भगवान'। असीम को सीमाबद्ध करना या उसका नामकरण करना सीमाबद्ध साधकों के द्वारा ही सम्भव होता है। असीम को एक छवि के रूप में रखकर उसकी पूजा करना समुद्र को डेंगी (छोटी नौका) द्वारा पार करने जैसा ही पागलपन है। इस विषय में माँ क्या कहती हैं जानते हो? जब एक-एक बिन्दु का मिलन ही महासागर या अनन्त विश्वप्रकृति है तब उस बिन्दु की पूजा से ही तो महाबिन्दु का संधान मिलेगा! मनुष्य यदि अपनी एक क्षुद्र चक्षुमणि की सहायता से बहुत दूर तक दृष्टिपात कर सकता है या फिर उसी क्षुद्र चक्षुमणि द्वारा दुरबीन की सहायता से ग्रह-नक्षत्रादि को भी देख सकता है, तो क्या वह देवता प्रदत्त दुरबीन से अनन्त विश्वप्रकृति को देख नहीं पाएगा?''

विवेकानन्द थोड़े स्तब्ध होकर बैठ गये और रामकृष्णदेव के वचनों को सोचते सोचते तन्मय होकर सिर्फ उनके चरणों की ओर ताकते रहे; पलकें स्थिर हो गई, सिर्फ बिन्दु-बिन्दु जल उनकी आँखों में झिलमिलाने लगा। अर्धनिद्रितावस्था में उन्होंने देखा, माँ भवतारिणी मानों रामकृष्णदेव के पास बैठी हुई उनकी ओर ताक रही हैं और कह रही है – ''अपने सखा श्रीदाम से कहना द्वार-द्वार भिक्षाटन से क्या हासिल होगा? तुम्हारे द्वार पर भिक्षा माँगने से ही सब कुछ समझ में आ जाऐंगे। तुम और कितनी परीक्षा दोगे? स्वयं को परीक्षा देने को कहो।''

रामकृष्ण सजल-चक्षु कहने लगे -''मैंने भी तुम्हारी बहुत परीक्षा ली है माँ, यहाँ तक कि अपनी आँखे भी निकालकर तुम्हारे चरणों में अर्पण करना चाहता था। उस समय यदि तुम मेरा दाहिना हाथ न पकड़ती तो शायद मुझे सदा के लिए नेत्रहीन होकर रहना पड़ता। माँ, तेरी लीला को कौन समझ सकता है! पाषाण मूर्ति से निकलकर हमारे साथ बातें कर रही हो, यह प्रत्यक्ष देख-सुनकर भी यदि मेरी ऐसी अवस्था है तो वे भला मनुष्य को देवता कैसे मानेंगे?''

...क्रमश:

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

प्रश्न ३८ : शिवलिंग का माहात्म्य क्या है?

उत्तर : यह समग्र ब्रह्माण्ड ही 'लिंग-ज्योति' स्वरूप है। बिन्दुरूपी शिव से दो ज्योति की धाराएं, एक पुरुषभाव में

एवं अन्य प्रकृति-शक्तिरूपा स्त्रीभाव में, निर्गत होकर समग्र सृष्टि को आच्छादित कर अवस्थान करती है। इसे ही 'लिंग ज्योति' कहते है। शिवलिंग सृष्टि का प्रतीक है शिव और शक्ति के समरस्य भाव को दर्शाता है। दो प्रकार के लिंग देखे जाते हैं - (१) शिवलिंग (२) विष्णुलिंग या शालग्राम शिला। इन उभय प्रकार के लिंगों को ही 'ब्रह्मलिंग' कहा जाता है। अतएव शिवलिंग और विष्णुलिंग उभय ही परमब्रह्म के प्रतीक स्वरूप है। –

''आलयं लिंगमित्याहुर्णलिंगं लिंगमुच्यते।
यस्मिन् सर्व्वाणि भूतानि लीयन्ते बुदबुदा इव।।''

–अर्थात् इन्द्रिय विशेष लिंग का परिचायक नहीं है, वरन् आलय ही लिंग है। आलय अर्थात् सर्वभूत जिसमें लय प्राप्त होते है। समुद्र में जैसे समुद्रोत्थित बुदबुद लयप्राप्त होते है, तद्रुप शिव से उद्भुत बुदबुद स्वरूप जीव समुदय जिसमें लय प्राप्त होते है, वही 'लिंग' है (शिव या विष्णु लिंग)। गुरुगीता में उल्लेखित है 'अंगुष्ठमात्र पुरुष:', वही है लिंग शरीर। लिंग शरीर का तात्पर्य है ब्रह्मदेह, जिसे हम अस्तित्वबोधक देह कहते है। लिंग शरीर के मध्य ही स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, शाक्त देह इत्यादि अवस्थान करते है। परमपुरुष शिव सर्वमय होने पर भी योगी साधक के हृदय मध्य वे अंगुष्ठ परिमित स्थान में अवस्थान करते है एवं इसीलिए वे 'लिंग' है और उसी लिंग की उपासना योगसाधना में की जाती है।

शिवलिंग की पूजा सगुण ब्रह्म की उपासना है। शिवलिंग की आकृति में निम्न में है प्राय गोलाकृति एक समतल और उस समतल के ऊपर लम्बा गोलाकृति शीर्षयुक्त एक स्तम्भ। इस स्तम्भ को शिवलिंग कहा जाता है एवं निम्न में गोलाकृति आधार को कहते है गौरीपीठ। आकाश लिंग और पृथ्वी हुई उसका आसन।

महाप्रलय के समय समस्त देवताओं का लय होकर एकमात्र लिंगरूपी शिव ही वर्तमान थे, इसीलिए वे लिंग शब्द से अभिहित हुए। अनन्त ईश्वर और तत्सूक्ष्मा मूला प्रकृति को सहज में ध्यान-धारणा के मध्य आनयन सम्भव नहीं होता। इसीलिए अधिकार भेद से इस लिंगरूपी शिव और शिवशक्ति परमेश्वरी कालिका देवी की आराधना करने की व्यवस्था ऋषि-मुनियों ने की है। शिवलिंग हुए आदिदेव के अर्द्धनारीश्वर विग्रह के मूर्त प्रतीक जो प्रवृत्ति एवं निवृत्ति इन दोनों मार्ग को ही चिह्नित करते है। इसी कारण से शिवलिंग का माहात्म्य अपरिसीम है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग की उपासना प्रकृतपक्ष में वेद के ज्ञान-कांड के पूर्णब्रह्म की उपासना है। शिवलिंग की उपासना से समस्त देवी-देवताओं की उपासना सिद्ध होती है। इसीलिए यह उपासना का एक उत्कृष्ट प्रतीक है।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

आश्रम समाचार

१५ जनवरी – श्रीश्रीगुरुमहाराजों के आसन प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य पर अखण्ड महापीठ आश्रम में वार्षिक उत्सव अनुष्ठित हुआ। इसी दिन प्रात:काल श्रीश्रीगुरुमहाराज की पूजा और यज्ञ सम्पन्न हुआ। दोपहर में हमारे गुरुभ्राता और भगिनियों के अथक परिश्रम से अनेक भक्तवृन्दों ने परितृप्तपूर्ण भाव से प्रसाद ग्रहण किया। संध्या में होने वाले सांस्कृतिक अनुष्ठान में पण्डित गिरिधारी नायक के 'ओड़िसी आश्रम' के शिक्षार्थियों ने भक्तिमूलक विषय पर नृत्य परिवेशन किया। अनुष्ठान के प्रारम्भ में 'हिरण्यगर्भ' की पूर्ववर्ती संख्या प्रकाशित हुई।

३१ जनवरी – २ फरवरी – आश्रम में त्रिदिवसीय श्रीश्रीगणेशयज्ञ सम्पन्न हुआ। ३१ जनवरी प्रात:काल में

श्रीश्रीबालगणेश की पूजा द्वारा इस पवित्र अनुष्ठान का शुभारम्भ हुआ। पूजा के पश्चात् यज्ञ, भोग निवेदन और प्रसाद वितरित किया गया उपस्थित भक्तवृन्दों के मध्य। संध्या में परिवेशित हुआ एक दृष्टिनन्दन नृत्यानुष्ठान 'श्रीगणेश'। नृत्यानुष्ठान में अंशग्रहण करने वाले कलाकारों में श्रमती सुतपा बसु, श्रमती पौलमी मुखर्जी और शिशु शिल्पी आरवराज बैनर्जी, अशोका बसु और श्रद्धा दासगुप्त आदि थे।

१फरवरी प्रात:काल श्रीश्रीसिद्धिदाता गणेशजी की पूजा आरम्भ हुई। पूजा के उपरांत यज्ञ, भोग वितरण और संध्या में गुरुभ्राता और भगिनियों ने एक मनोरम संगीतानुष्ठान का परिवेशन किया।

२ फरवरी के दिन श्रीश्रीमहागणेश की पूजा यज्ञानुष्ठान और भोग वितरण के पश्चात् संध्या में भजनगीति के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से सपन्न हुआ श्रीश्रीगणेशयज्ञ।

१९ फरवरी – श्रीश्रीमाँ आश्रमस्थ कुछ भक्तों के साथ होटोर आश्रम के वार्षिक उत्सव में गयी। वहाँ श्रीश्रीमाँ की पूजा और आरती के माध्यम से श्रद्धा ज्ञापित की साध्वी सुचेतानन्दमयी और साध्वी पुण्यानन्दमयी ने। आश्रम की ब्रह्मचारिणियों और शिष्याओं ने एक-एक करके श्रीश्रीमाँ को श्रद्धा निवेदन किया। परिशेष में आश्रम के विद्यार्थियों ने एक सुन्दर सांस्कृतिक अनुष्ठान प्रस्तुत किया।

होटोर से लौटने के पश्चात् संध्या में श्रीश्रीमाँ की उपस्थिति में श्री सुब्रत सेनगुप्त ने रवीन्द्र संगीत परिवेशन किया अखण्ड महापीठ आश्रम में।

२४ फरवरी – शिवरात्रि की संध्या में श्रीश्रीमाँ अपने हाथों से एकान्त में शिवपूजा करती है। मध्यरात्रि में यज्ञगृह में श्री यज्ञनारायणदा ने शिवरात्रि का यज्ञकार्य संपन्न किया।

१२ मार्च – दोलपूर्णिमा के उपलक्ष्य पर आश्रम में दोपहर में श्रीश्रीराधामाधव को भोग निवेदित किया गया। संध्या में नृत्यानुष्ठान में पण्डित गिरिधारी नायक के शिष्यों द्वारा परिवेशित हुआ वसन्त उत्सव का मनोरम नृत्यानुष्ठान।

२६ मार्च – आध्यात्मिक सभा के २२ वे पर्व पर मातृ-संतान डा० वरूण दत्त ने 'कठोपनिषद्' पर मधुर व्याख्यान का परिवेशन किया।

४ अप्रैल – नवरात्रि की अष्टमी तिथि के प्रात:काल में श्रीश्रीअन्नपूर्णा माँ की पूजा अन्नपूर्णा मंदिर में संपन्न हुई। पूजा के पश्चात् उपस्थित सभी शिशुओं और भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया।

५ अप्रैल – इस दिन सायंकाल आश्रम मंदिर में राम-नवमी के अवसर पर एक सुन्दर भजनानुष्ठान सम्पन्न हुआ।

१४ अप्रैल – श्रीश्रीमाँ के आगमन हेतु बहु भक्तवृन्द गुरुभ्राता राजेन्द्र सेठिया के गृह पर एकत्रित हुए थे। संध्याकाल में संगीत एवं सत्संग के पश्चात् भक्तवृन्दों ने परितृप्ति के साथ प्रसाद ग्रहण किया।

आगामी अनुष्ठान सुची

बुद्ध पूर्णिमा – १० मे, बुधवार
अध्यात्मिक सभा – २५ जून, रविवार
गुरु पूर्णिमा – ९ जुलाइ, रविवार

Rudravatar Sri Gorakshnath

The 'Natha-yogi' sampradaya has an illustrious history of deep philosophical foundations developed, practiced and demonstrated by great masters. Like many other spiritual lineages, the Nathas also draw their basis from Shaiva philosophy and its yogic underpinnings. The word 'Natha' denotes Master or Lord. The legendary Natha Gurus, who are still revered today, transcended narrow religious superstitions and stressed on spiritual realization and purity without differentiating across caste or creed. Having attained Shiva-hood and fully realized in Brahman, the powerful Natha masters were considered 'Rudra' avatars. There is also a legend behind them being considered originating from Vedic Rudra Brahmins. The 8th and 9th chapters of Brahma-Vaivarta Purana mentioned the emergence of the Rudra Brahmins from the forehead of Lord Brahma (in his quest to beget Lord Shiva as his son), particularly the original eleven great Rudras. These eleven Rudras form the origin of the Natha-yogi lineage. Each of them were great yogis and they followed the path of attaining knowledge through the path of nivritti and yoga, and on obtaining realization, engaged in service for the welfare of mankind. They attained great yogic powers which were often considered miraculous. Through great penance, they were able to obtain mastery over body, mind and spirit and thereby progressed towards realization of immortality and freedom. The Nathas have been responsible for evolution and dissemination of Shaiva-Yogic philosophy since ages. Their primary goal is realization of Param-Brahman through attainment of Yogishwar Shiva-hood. Their lineage is rooted in Adinath Lord Shiva and blessed by spiritual giants such as Sri Matsyendranath or Meennath, his great disciple Sri Gorakshnath – accepted by one and all as a Shivavatar in his lifetime.

Sri Gorakshnath

We examine the spiritual legacy of Nathayogi Sri Gorakshnath. 'Go' means the universe and 'raksha' means to protect and preserve. 'Nath' refers to Lord or Master, who is a tapaswi, renunciant-yogi, in union with Brahman and bestower of spirituality. Thus his name is akin to the supreme master who governs the three worlds, namely Lord Shiva himself. Sri Matsyendranath Bhagwan was a direct spiritual son of Lord Shiva himself and Sri Gorakshnath was his fully accomplished disciple. Their region of influence spans not only in India but across Nepal, China and Tibet, etc. The book 'Navanath Avisaar' gives an interesting account of the birth of Mahatma Gorakshnath. Once on a pilgrimage, Bhagwan Matsyendranath came to a town on the borders of Bengal. He reached the home of a woman called 'Saraswati' to seek food. After respectfully handing him the 'bhiksha', the woman realizing Matsyendranath to be a person of great spiritual powers, requested to be blessed with a son. Feeling sympathy for the woman, the saint gave her some blessed

ash (vibhuti) and asked her to consume it as it would enable her to have a child. After the mahatma departed, other ladies began to make fun of Saraswati's interaction and in the process she lost faith in the 'blessed powder' given to her. She threw away the vibhuti in the bin where unused cow dung and other rubbish were kept (called 'goraksha' in local language). After twelve years, Sri Matsyendranath returned to the same place and again went to the woman's house. When she came out to give him some bhiksha, he asked for her son. On hearing what had transpired, the saint remarked, 'My siddha vibhuti is destined to have borne fruit. Take me to the place where it was left by you.' On reaching the spot, Sri Matsyendranath called out loudly for the boy and to everyone's surprise, from within the big dump, a twelve year boy came out and stood in front of him. Having emerged from a 'goraksha', he was named 'Gorakshnath' and Sri Matsyendranath took him away. This legend tries to indicate that Sri Gorakshnath was an ayonisambhava (born outside of a womb) who simply manifested from his earlier yoga-siddha state through kayakalpa.

Sree Sree Maa mentioned, "The great yogi clan of Sri Matsyendranath, his disciple Sri Gorakshnath and Gorakshnath's disciples, the nava (nine) Naths have their origins in the eleven Rudra-avatars who emanated from Lord Brahma along with Adi Rudra (Shiva) after Lord Brahma performed penance for having Lord Shiva as his son. The eleven Rudras received the highest form of Yoga from Bhagwan Shiva himself and performed great penance to attain perfection." There are many tales relating to the birth of Sri Gorakshnath of which the earlier mentioned one is most popular. Another tale indicates that he emerged from the jata (mat-locked hair) of Lord Shiva. Most such stories indicate a womb-free birth and a direct association with alakh-niranjan-swarupa Shiva-Brahman. He is therefore revered as a Shiva Avatar. The present town of Gorakhpur is named after him as this place is considered his major tapasthali. The great Natha-yogi Sri Gambhirnath-ji (who according to Sree Sree Maa's inner realizations is one of the Nava Nathas in a later embodiment) indicated that the Gorakhpur asana is preserved since Treta Yuga, though the temple is from a later period. Another legend mentions Badrikashram as the first tapasya place of Sri Gorakshnath where he spent twelve years. Later he went to Nepal and from there he reached the place now called Gorakhpur and attained siddhi or perfection. Study of various scriptures indicates the mention of Sri Gorakshnath from as early as Satya Yuga to the fifteenth century AD. His disciples consider him as an immortal personality who still dwells in his astral and subtle embodiments. The 'kaan-phatta' (ear-torn) yogi sect is said to have emerged from the teachings of Sri Gorakshnath in the fifteen / sixteenth century AD.

Sree Sree Maa gave us some more unique clues about Sri Gorakshnath's presence in recent times as well. In addition to confirmation about the eleven Rudra avatars, she told us an interesting tale about our Sri Sri Saroj Baba's meeting with Sri Gorakshnath. Once during his pilgrimage in difficult Himalayan terrains on the way towards Manasarovar, Sri Saroj Baba came across an ancient sage-yogi sitting in a cave in deep Samadhi. His emaciated body, matted hair coming down to the floor, even the eyebrows had become matted like jata covering part of his face, indicated great age of the saint. His eyes were closed and a lighted dhuni was placed in front of him. Sri

Sri Baba knelt before him and offered his respects. The saint opened his eyes after removing the matted hair covering them. Rays of light-blessings emanated from his eyes and he uttered a single phrase, 'Saptam-purush' meaning 'Seventh generation scion' indicating that Sri Sri Baba was the seventh generation of his family name – which Sri Sri Baba later found to be true. Subsequently, from his inner realizations, Sri Saroj Baba was able to fathom that this ancient kaya-siddha mahatma was none other than Sri Gorakshnath himself. Sree Sree Maa also mentioned that Sri Gorakshnath and his nine disciples had come again in recent times in the twentieth century and showed us their pictures and more recent names. (We were initially surprised but then found many interesting connections in the lineage. Realized saints have a different eye which enable them to 'see beyond' what we can. Having spent many years in the presence of Sree Sree Maa, we have now got somewhat used to this.) Some of his disciples of this latest leela of Sri Gorakshnath and his enlightened group are alive in person even today and are great Paramhansa saints in their own right. Through Sree Sree Maa we have been fortunate to have met two of them during a few of our annual trips to meet saints and savants around Uttar Pradesh and have been blessed by them. Recently we also went to Gorakhpur and visited the ancient site of the great yogi-saint's sadhana seat and paid homage. Maybe at some other time, we will be permitted to present this more recent interesting tailpiece on Sri Gorakshnath and his celebrated clan's continued history, achievements and contributions[1].

Sri Gorakshnath was not only a great yogi-saint but an extraordinary philosopher and writer. He has authored several texts which are both spiritual and literary masterpieces. He was probably one of the earliest of poets who composed in Hindi language. We present below some of the treasures of the great yogi saint's philosophy and path (taken from the book 'Goraksanatha's Works and Philosophy' by Sri Jadunath Sinha).

Natha Brahman and Shiva-Shakti are fundamental to this philosophy. Sri Gorakshnath presents them as follows:

NATHA BRAHMAN:- The Supreme Reality (para tattwa) cannot be known in terms of diverse empirical objects which exist in time and space. The former is non-spatio-temporal while the latter is temporal and spatial. Supreme Reality is integral, of non-phenomenal origin and ground of all phenomenal subjects and objects wherein they are dissolved. It is beyond existence, non-existence, both existence and non-existence, devoid of origin and destruction, and beyond all imagination. It is formless, integral, incomprehensible, immovable, eternal, unconditioned and desire-less. Intuitive experience of the supreme Reality destroys birth, death and rebirth. The light of infinite consciousness which shines in the heart of an individual and in the cosmic body is Natha Brahman, which is intuitively experienced in the heart. This is the Supreme Reality. The Supreme Unity (parama advaita) which exists in the formless and the formed, in the unqualified and qualified is Natha-Brahman. In the beginning there is creation, in the middle there is modification in the state of maintenance, and at the end there is

[1] If anyone wants to specifically know it in private, please bring some packets of chocolate nutties, adequate enough for all nuts like us to share.

dissolution. Natha Brahman abides in them all. In the beginning there is duality, there then there is unity, then there is unity-in-duality and then there is supreme unity which is Natha Brahman. Natha Brahman is devoid of duality and non-duality and yet is the ground for duality and non-duality. Natha Brahman resides above non-duality as the supreme deity of bliss and salvation. Natha Brahman is distinct from Void and non-Void, is of the nature of knowledge and bliss, without a substrate, illuminates the cosmos, although devoid of sun and moon, abides in each body of the individual soul as the luminous light of consciousness and is the Lord of salvation. Natha Brahman manifests its self in the form of Shiva-Shakti.

SHIVA-SHAKTI:- Shiva-Shakti, Absolute Spirit is the ultimate reality. Shiva-Shakti folds and unfolds into each other in Natha or Natha Brahman. Shiva is conscious and his Shakti is also conscious. Shiva-Shakti is one, infinite, dynamic consciousness. Shakti is Shiva's own power. Shakti exists in Shiva in the undifferentiated state prior to creation. She exists in her natural state as the witness-power in this state, as the seed of the phenomenal world and the non-phenomenal state. She is united with Shiva without duality. The one supreme Shakti manifests herself in non-phenomenal and phenomenal orders, and harmonizes them into a unity in the trance-consciousness (Samadhi). The supreme spirit (Para Shiva) is absolutely one. Shiva and Shakti are not two ontological realities. They are two aspects of one reality, Absolute Spirit. Shakti is the dynamic aspect and Shiva is the static aspect of one absolute spirit. Shakti exists within Shiva and Shiva exists within Shakti. Shiva endowed with Shakti is the supreme lord, assumes the form of the world, and has the power of maya. He is both transcendent and immanent.

Sri Gorakshnath describes in details in his writings the philosophy of creation, unfoldment of Shakti, the cosmic body, prakriti and individual soul, amritsiddha yoga, relationship between paramatman and jivatman, the human body and the chakras, and develops a complete yogic philosophy and practice that unifies much of Vedanta, Yogasutras, Shaivism and also key elements of Buddhism, especially Nagarjuna's Shunya philosophy. Sri Gorakshnath's philosophy presents an evolved continuum of the resolute path of the great souls of our sub-continent in taking spiritual science forward in a unified manner by combining the essential fundamental realizations of others and adding their own unique contributions. He remains a revered figure in the spiritual community.

We end with some priceless definitions of Sri Gorakshnath (taken from the above-mentioned book by Sri Jadunath Sinha) which I felt worth sharing with fellow aspirants:-

1. He / She is a brahmacharin who has acquired the knowledge of Brahman and moves about as the knower of Brahman and who is full of the consciousness of his / her self.
2. He / She is a householder whose better half is lasting fulfilled inner and outer completeness and who has motionless inner and outer akasha as his / her house.
3. He / She is a hermit who always wanders in self-luminous consciousness within him / her.
4. He / She is a monk who has attained union of his / her individual self with the supreme self.

5. He / She is called a sannyasin because he / she has surrendered his / her all to the self-luminous supreme self.
6. He / She is a Vira, who dissolves all principles (tattwas) and preserves them in their essence in his / her self.
7. He / She has attained nirvana who is absorbed in this state after abandoning all destructible entities.
8. He / She is a shaiva, who knows Shiva, who is pure, calm, formless, always self-manifest and possessed of supreme bliss.
9. He / She is a shakta, who knows Shakti as the union of kula and akula. A shakta abides in transcendent consciousness in the great power of self-manifestation of Shakti.

–her Blessed Child

Prof. Partha Pratim Chakrabarti

Biography of Manicklal Dutta

[A disciple of Mahavatar Sri Sri Babaji Maharaj]

(1)

It is the Guru's grace that I ventured to narrate the great life, initiation from his Guru and the sadhana of an enlightened soul and in doing so I would like to highlight the details of his family identity to the readers. Needless it is to say that the family lineage and the birth of a Godly person displays some sparks of Godliness.

The grandfather of Late Manicklal Dutta Mahasaya, who was later widely known as Kalimuktawala, was the only child of his parents. He lost his father in childhood, left his native place at Murshidabad because of enemity with his cousins and settled with his mother at Chinsurah. She started staying at Kamarpara market at Chinsurah four-point crossing fully with the help and assurance of the descendents of Late Sagar Dutta. (Presently the clinical laboratory of Dr. Paresh Chandra Dey is situated in this house). Gradually, when Kalicharan became older, he moved to Kolkata for business purpose, for which he was spontaneously attracted. In those days, Chinsurah was not connected to Kolkata by railways and hence the only way available was to cross the Ganga and reach through the waterway. It was a tryst with destiny that he came into contact with Raja Badridas. Badridas left his own place, came a long way to Kolkata, and by the dint of his dedication and honesty earned a lot of money and wealth and acquired the title 'Raja'. After his meet with Badridas, Kalicharan started his pearl business and within a short span of time he started amassing money. Thus Kalicharan became very intimate to and a favourite of Badridas. In this connection, the grandson of Kalicharan, Manicklal's short business life was influenced by Badridas. There are evidences that Kalicharan established close relation with the raja, maharaja and the rich class of this country as also the aristocrat families of England pertaining to his pearl business.

There were lot of pearls in those days in the Ichhamati river. Kalicharan had the principal duty of collecting these pearl from the river. These collected pearls were packed and sent to Chinsurah, where the pearls were purified and processed and then perforated in very fine machines before they can be used. Manicklal's father, Sri Shyamacharan the second son of Kalicharan was an expert in these activities and so he was entrusted with the responsibilities of the factory at Chinsurah. The pearls that became suitable for use after processing were sent to Kalicharan's shop at Kolkata.

The factory in Chinsurah was located in the Shunripara where presently the house of

Haradhan Das and other shops to its north are situated. The birth place of Manicklal Dutta is also in this Shunripara. The two-storied house built of brick, where the pious birth of Manicklal Dutta took place is still present.

Slowly, Kalicharan's luck favoured by the grace of the almighty Mother and he became the possessor of lot of properties at Chinsurah. He built the temple of the holy Sri Sri Radharaman Jiu and set the idol for daily worship and that speaks volumes of his dedication to God even today.

The elder son of Kalicharan Dutta Nitaicharan Dutta was more educated than the second son Shyamacharan and used to stay at Jaanbazar, Kolkata for his work. Shyamacharan was married to the Bardhans at De-para, which was situated to the west of a pond lying at the back of the residence of Kalicharan. Though in those days, women education was not that prevalent, especially so in the Suvarna-Banik caste, yet Manicklal's mother was highly interested in learning and education. She stayed and learned in a convent school situated in Hooghly.

The details of the Guru and initiation of the religious-minded Kalicharan is not known with certainty but I elaborate whatever I have come to know from the employees of his Kolkata office and his second son Shyamacharan. Manicklal has described that it was his childhood when Kalicharan left his domestic life and followed a high-souled mystic. It was in his later life that Manicklal was initiated by the same compassionate mystic in an auspicious hour.

One day, Kalicharan was sitting in his pearl shop at Kolkata when suddenly a sanyasin appeared at his door. He addressed Kalicharan and said, "Don't you want to go?" Kalicharan answered, "I am ready, my master." The saint said, "Follow me then" and started advancing and Kalicharan followed him as if in a hypnotic spell. The bunch of keys of the shop and the safe were lying there. His employees dared not utter a word and his beloved son Shyamacharan was twenty-three miles away from him in Chinsurah. Shyamacharan received a letter, written by his father from Varanasi after about a week. The letter brought the first and the ultimate bad news from his father. In the letter, Kalicharan has addressed his beloved son that "I came with Guruji under his instruction. Do not try to find me out, you can't." Shyamacharan became utterly dejected and discouraged at this news and found the continuation of the pearl business almost impossible without his father. As previously mentioned, Kalicharan's pearl and bejewelled ornament business was primarily restricted within the raja, maharaja and the elite class where the common man couldn't enter without sufficient identity. Kalicharan used to stay in Kolkata and mediated this business directly, hence Shyamacharan didn't have the privilege of direct interaction with this class of customers. So he didn't have any other option but to close the shop in his father's absence as it was impossible to imbibe faith among those class of customers. Shyamacharan could procure a few pearls from the shop. He had the doubt that the employees of the shop had stolen the pearls and other ornaments before his advent, as soon as his father had disappeared. Anyhow, he sold the procured pearls and with the money he started for Varanasi after confirming the name of the place stamped on the seal of the letter. The purpose was to find out his father and bring him back home. After reaching Varanasi, he started searching frantically several ashramas, religious establishments and inn and incurred a good amount of expenses but in vain. On the other hand, he inclined more towards a

saintly temperament because of his intimate interaction and stay with the sadhus. Shyamacharan was initiated by the living Shiva of Varanasi - Sri Sri Trailanga Swami. Because of his long absence from home, the care of his children was under the custody of their mother's brother. Shyamacharan became a sadhu with long matted hairs and returned home after long 12 years, but his house couldn't attract him anymore and he returned to the sadhu's ashrama. He spent most of his life in this way and in old age he came back to his house in Chinsurah and passed the remaining period of his life there. Shyamacharan never performed the last rites of his father. He was told by some saints that his father was alive. Funeral rites of living persons are forbidden. Even Manicklal also avoided the rites ceremony of his grandfather. In old age Shyamacharan used to subsist on food cooked by himself. He never took bath but always looked fresh as if bathed shortly. He used to keep different medicines given by the sadhus in his matted hair and he distributed those medicines to the sick, distressed and his own people for their benefit. He was the father of seven sons and one daughter and Manicklal was the eldest among them. He left his mortal coil in 1945 in his Kamarpara residence at Chinsurah. *...to be continued*

—Sri Ardhendu Sekhar Chattopadhyay

Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Gems From the Garland of Letters

[Letters of Bhagwan Kishori Mohan]

(22)

Spiritual Advice Towards a Disciple (...Continuing)

The Shruti says,

Tribhir guna-mayair bhavair
ebhih sarvam idam jagat
Mohitam nabhijanati mam
ebhyah param avyayam

Meaning: Being veiled by the revealing (*Sattwah*), distractive (*Rajah*) and delusive (*Tamah*) tendencies of the mind, the *Jiva* cannot realize me as the One beyond these three-folded mental traits.

The above verse essentially expresses that the self originally exists in a state beyond the realms of the three-folded mental traits. There are many similar verses within the *Bhagvat* Gita. For example,

Sarvam karmakhilam partha
jnane parisamapyate

Meaning: All fruitive activities cease and culminate into the attainment of divine Knowledge.

Aatmanyeva-cha santushtastasya
kaaryam na vidyate

Meaning: The entirety of all duties terminate for the person who revels only in the eternal essence, and is contented and satisfied only within the essential Self.

Gyanang labdha parang shanting

Meaning: Attainment of Knowledge leads to Absolute divine tranquility.

Ajnanenavrtam gyanam
tena muhyanti jantavah

Meaning: The *Jiva* deluded by the envelope of ignorance becomes an automaton controlled by the gunas.

Kama-krodha-vimuktanam
yatinam yata-cetasam
Abhito brahma-nirvanam
vartate viditatmanam

Meaning: Those who have a disciplined mind cleansed of desire and anger, are assured to be quickly liberated and led unto the ultimate Truth of the Self.

Shantim nirvana-paramam
mat-samstham adhigacchati

Meaning: Perfected union of the individualistic consciousness with the Universal Consciousness leads to the ultimate and absolute bliss of Nirvana through the cessation of all material existence into the spiritual effluence of the Absolute impersonal Identity.

Labhante brahma-nirvanam
mrishayaha ksheena kalmashaaha

Meaning: Liberation in the Supreme is achieved through the inward endeavor towards self-realization by those seers of Truth who have dispelled all impurities within.

Tad-buddhayas tad-atmanas
tan-nisthas tat-parayanah
Gacchanti apunar-avrttim
jnana-nirdhuta-kalmasah

Meaning: Liberation from material existence is attained when Knowledge cleanses all illusions in those whose intelligence, mind, faith and dedication is steadfastly affixed in the Supreme.

Bhaktya tu ananyaya sakya
aham evam-vidho Arjuna
Jnatum drastum-cha tattyena
praveshtum-cha parantapa

Meaning: Only through unwavering devotion can one realize me in my original and essential form and can become an eternal part of me.

In the above verse, the word "*tattyena*" refers to the manifestation of the enlightened Self as *Sat-Chit-Ananda* (Existence-Consciousness-Bliss) beyond the tri-attributed mental traits. The word "*praveshtum-cha*" attempts to convey that the *Jiva* beholds and perceives the Supreme in His original form and later enters into the ultimate Union with Him. This is the essence of *Kaivalya* or *Nirvan-Mukti*.

Paramatma refers to the One and undivided Universal Consciousness, the eternal undivided source and manifestation of *Rasa* (the emotive principle). One who attains this state enjoys everlasting divine bliss and tranquility. It leads to the cessation of all his distresses. The enlightened *Jiva* is fully absorbed and becomes one with the *Paramatma* after he releases his mortal coil in *Videha-mukti*. This may be referred to as the finest accomplishment at the epitome of the glorious culmination of all meditative penance.

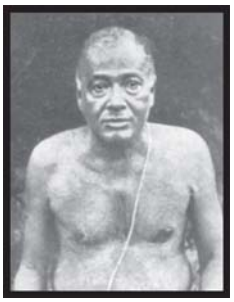

However, liberation of the *Jiva* in *Nirvan-mukti* does not lead to the loss of his identity resulting in non-existence. If liberation would lead to destruction of the identity, people would never ever endeavor to achieve it, as nobody desires his own destruction; even the ever supportive and compassionate *Shruti* would not deliver such advice.

Social behaviour and interactions do not cease completely after the attainment of liberation (*Jivan-mukti*). The *Shruti* and many other sacred scriptures have said that the *Jivan-mukta* Guru delivers advice on the attainment of liberation to his disciples. If he would become disconnected and oblivious about the external world, how could he then deliver such advice? The enlightened individual may remain alive and associated with his mortal coil for a long time even after the attainment of *Jivan-mukti*. It is a dire misconception that the mortal coil is renounced during *Jivan-mukti*. He continues to remain associated with his body to experience the fruits of committed actions.

—Her blessed child, **Sri Arnab Sarkar**

The Philosophy of Truth

The Proof of Unreality of the World

Chapter 10

Bhakta: O God! Even if you prove the world not to be false, it is difficult to believe that the creation is really false. This is because everything including wife and son, wealth, food appears to be real and I gain joy by interacting with them really. Hence how come I designate this truly visible world an unreality?

Mahatma: My son! In case where you mistake the rope to be snake, the rope remains as rope itself though you visualise the rope to be a snake, similarly when you mistakenly see the atman as world, that paramatma never changes to be the world though you visualise the world perceptibly. My son, if you consider all directly visible objects as true without any discrimination, then why don't you stamp the reflected image of man in a mirror, the image of a man in cinema and the directly visible things in magic as true? You can clearly understand the unreality of this visible world in the way you have understood the falsehood of the above appearances through logic and judgement.

The outlook and the logic of human being is two fold. The judgement and outlook through infatuation and the same through discrimination. The world appears to be true when analysed through attachment, and false when judged on the basis of discrimination. One, who is extrovert and full of desires, he look at material existence with attachment and one who is dispassionate and renunciating, he looks at this world with discrimination. The outlook and judgement of this dispassionate man is truly correct. My son, I narrate you a true story, give it a patient hearing —

An old Brahmin lady of a village went to her sister's in-laws house in Kolkata. Her sister and her husband took her to a cinema. This lady of the village has never seen any talkie cinema (motion picture with sound), so she had a firm belief that live people are acting in the cinema. Her sister's husband, who knew the true nature of cinema, explained to her that these are not live people acting. The lady felt that he was joking with her. So, she said, "I saw the live people dancing and singing in the cinema, how come they be false?" Many other people tried to convince her but in vain. On the contrary she contradicted them and declared repeatedly, 'I saw with my eyes that man jumped into the water and water drops splashed up, the soldiers moved forwards riding on their horses and I could even hear prominently the sound of hoof of the galloping horses. So how could you say these directly visible humans as mere pictures? I am not a kid so that you can baffle me regarding these living humans and can put me into confusion.' Thus she couldn't believe it as picture. Hence, my son it is your ignorance that you believe this world as reality like the lady. Think and judge that direct visualisation is not always true. You see that the sky is blue. Even several learned men and poets have mentioned it blue in their writings and poetry. But in fact, the sky is not actually blue which the scientists and philosophers have proved. If you want to see the sky from close vicinity and thus rise up and up, you will see high-up the sky is transparent and void, there is no trace of blue color. Sruti has also said, 'abkash - swabhavban' - meaning the nature of sky is abkash ie. emptiness. See how your direct vision is being baffled here.

...to be continued

(Excerpts from Sri Kalikananda Abadhoot's "Satya-Darshan" in Bengali)

-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

My Life With Anirvan

Part - XXXI

We passed the night of 22nd August peacefully in quite happiness, talking and dreaming about our Darshan of Lord Amarnath next morning!

We got up early in the morning and prepared ourselves for the last climb to Lord Amarnath. Again the announcement was made that only those who can go on foot will be allowed to go up the cave. It so happened that many could not have the Darshan of Lord Amarnath even though they had come upto Panchatarani. Among them were some of the Swamiji's of Ramakrishna Mission whom I met later after coming down from the cave of Amarnath! Though the climb is narrow and the path little difficult, we easily climbed up and reached near the cave of Amarnath, which is at a height of 12500 feet.

Sri Gautam Dharmapal

By the side of the cave flows Amarganga – a small rivulet coming out of the ice cave! The water is icy cold, but many people of all ages, old and young were taking bath before entering the cave. The sun was shining brightly and it seemed as if I was dragged to lunge in the cold waters of Amarganga! I, who would not take bath in winter without adding hot water! Taking the name of Lord Amarnath, I took three dips and came out, the body all numb with cold! Natvarbhai was waiting with my clothes! He did not take bath! Because of the hot sun, I was fine after a few minutes and then we together climbed to the cave. The cave has a big open entrance (mouth like) and inside at three corners there are three lingas – the biggest one being the Shivalinga of the Lord Amarnath. At the other corners, a flat lingam is called Parvatiji and the third lingam is that of Ganesha. While entering the cave, I was almost in a deep meditative mood. My mind was vacant – void. I was almost falling down but Natavarbhai held me by his hand and after paying my obeisance at all the three lingas – one by one, I came out with Natavarbhai and sat down on a rock outside for a few minutes.

We came down from the cave to Panchatarani by 12-00 noon. Gulam Kadir was ready to start the journey downwards having packed the tent and all other things. We finished our lunch together, hired two horses to go down upto Seshnaga where we reached in the evening. Instead of staying at Seshnaga we came down a little further at Zozipal just above the Pisughati. We passed the night at Zozipal.

On 24th August, we got up early in the morning and after tea and breakfast came down the descent of Pisughati and reached Chandanvadi at about 10-30 in the morning. At the end of our pilgrimage to Amarnath, we walked the last distance of 10 miles from Chandanvadi to Pahelgam; back to our Hotel Regal by 3-00pm. Both of us rested in Pahelgam that evening and night and left for Srinagar next morning i.e. 25th August by bus. We reached Srinagar at about 2-00pm. Friends of Natavarbhai were waiting at the bus-stop with their car and took us to the House boat "Windsor" which he had already hired.

I passed these days in Srinagar with Natavarbhai and his friends during which we visited different places around Srinagar. One day we went to Tanmarga, Gulmarga,

Khilanmarga, etc. Another day we went to Gandarbal, Manasbal and Woole lakes, Shopore, Baramullah, Patton and other places.

On 29th morning we parted Natavarbhai and his friends left by their car early in the morning and I took the bus to Pathankot at 8-00 in the morning.

I took the train to Calcutta from Pathankot on 30th evening and reached Sealdah at about 7:30pm on 1st September.

Before leaving Sri Ramakrishna Maha Sammelan for Amarnath, I had written a postcard to Anirvanji and informed him about my possible date of return.

After returning to Calcutta, I wrote a detailed letter to Sri Anirvan about my actual pilgrimage to Lord Amarnath. Unfortunately, I did not keep a copy of that letter nor do I have the letter which I wrote to Sharad and Sudha from Srinagar.

-Sri Gautam Dharmapal

Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo

(34)

One day Angshuman (one of Sri Sri Baba's disciple Angshuman Banerjee) had an intense desire of offering fish curry to Dada, prepared from his house. But Angshuman used to stay at Dada's house at that time and had meals there. Hence he purchased fish from Ramrajatala market and got them chopped in the market and cooked by Boudi (wife of dada). When Dada sat for his food, he went there and served the cooked fish to Dada. In the meantime, Ashishda was present there. But Dada didn't agree to have the fish then. He said, "I don't feel having it now." But after repeated requests by Angshuman, somehow Dada consumed the fishes hesitatingly. After Dada finished his meal, Ashishda tasted a bit of the curry from the remains on Dada's dish and it was so bitter that Ashishda could not put any more in his mouth. Ashishda was surprised on how could Dada swallow such bitter — taste fish? It so happened that the gallbladder of the fish got ruptured and the fish was smeared with bile and that lended the bitter taste. Ashishda asked Dada, "Dada, how could you consume such a bitter-tasted fish?" Dada said, "Angshuman requested me to have it with much keenness and love, how could I refuse him?" This is our Dada exhibiting universal tolerance.

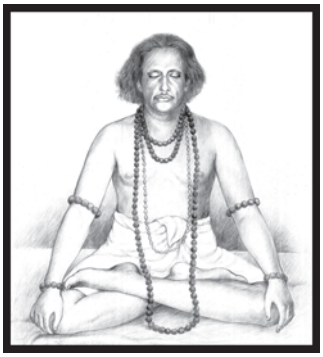

The mahatmas sense the keenness of the devotees, the magnitude of their devotion and not on the external matters. They accept the love of the devotees without any mental perturbation. Besides this, it is also noticeable that it is not prudent to go against the wish of the mahatmas. It is never advisable to fulfill one's desires against the sadguru's will. It is always wise to perform an action with the sadguru's permission, otherwise the action ends up with utmost futility.

(35)

This incident happened in front of Ashishda, so the incident is being narrated in Ashishda's own words —

An old gentleman used to sit near Dada. He used to emit a very disagreeable odour from the inside of his nostrils, that used to diffuse throughout the room. I asked the gentleman once, "What

is the matter? Why such a bad smell is coming from your nose?" He said, "I have shown a lot of doctors but it seems to be incurable." The gentleman started sitting a little away from Dada. After a few days, I was sitting near Dada and was surprised to find the same bad smell coming from Dada's nostrils. I said Dada, "How could this happen? Wherefrom you have contaminated this disease? You didn't have this disorder before?" Dada kept absolutely quiet. After a few days, Dada's nose got cured. After a few days more, when the gentle man arrived, He too was not emitting any bad odour. This is the reason why we never used to share our ailments with Dada.

The mahatmas accept the disease of others silently. Frequently, the patient is not aware that he has received the grace of the mahatma. The mahatmas on the seat of sadguru are full of compassion. But one should not pray for the cure of disease to a mahatma openly. On the other hand it is better to erode the prarabdha karma through different virtuous or charitable works and know the process of cure of the disease.

(36)

One day, some of our guru-brothers assembled at Master-mahasaya's house for satsang. I (Pradip Chatterjee) was not present there at that time. Ashishda, Asimda and others were present there. Actually I did not come in direct vicinity of Guru Maharaj then. Let me introduce this master-mahasaya first.

The name of master-mahasaya was Sri Pranabesh Ghosh. He was the signal-man at Padmapukure railway station. Later on he became the signal station master at Santraganchi rail station. He used to control the matter of signal with great responsibility and competence. Hence he was known to everybody as master-mahasaya. Sree Sree Maa and master-mahasaya were both in close vicinity of Sri Sri Baba. I have heard from Sree Sree Maa that master-mahasaya was initiated by Sri Sri Baba and was an advanced kriyaban. He used to come almost daily to his guru's abode for serving Sri Sri Baba. Sree Sree Maa said that Sri Sri Baba showed him the subtle view of several mahatmas, who used to come in Linga-sarira (subtle body) to meet Him daily. This master mahasaya happens to be an intimate man of Sri Sri Baba in his several preceding births. This was known to many and hence they used to gather at his residence for religious and pious talks.

Now, let me come back to the incident. In the discussion, some talk was started which seems to non-spiritual and not relevant to the discussion, probably pertaining to someone. When Ashishda wanted to join in this matter, suddenly his voice became choked. Inspite of several endeavours, he could not speak out. Ashishda felt as if someone has compressed his throat. He could not utter till the time the discussion went on. Helplessly, he kept listening to the discussion. But miraculously, when the discussion ended and everybody came out through the door of the house, Ashishda started speaking in his natural tone! Ashishda could not find any reason for this. But Ashishda was not afraid of his choked voice because he felt that it was the wish of Dada. Next day when he visited Guru Maharaj, he said, "Ashish, did you hear the songs and music at master mahasaya's house?" Ashishda was surprised as Sri Sri Baba was not informed of Ashishda's visit to his house. This shows that Sri Sri Baba used to be present in discussion amidst his disciples invisibly.

...to be continued

-Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur

-*Translated into English by Her Blessed Child* **Dr Barun Dutta**

News in Brief

15th January: The 8th anniversary of the enthronement ceremony of the Guru Maharajas was conducted with full majesty. Puja of the Guru Maharajas was conducted in the morning by Sri Jagna Narayanda followed by yajna and offering of prasad. In the evening, a cultural session was organized where an enchanting dance program was conducted by the troupe of Pandit Sri Giridhari Nayak. The previous issue of Hiranyagarbha was also released. The cooking of the sacred offering (bhog) and its distribution among all the devotees was another very important aspect of the ceremony.

31st January - 2nd February: Sri Sri Ganesh yagna was organized at the Ashram premises during these three days. This pious event commenced at dawn on 31st January with the worship of Sri Sri Bal-Ganesh. After worship, yagna was performed, bhoga was offered and prasad was distributed among the devotees present. An enchanting dance programme "Sri Ganesh" was organized in the evening. Performers in this dance programme included Srimati Sutapa Basu, Srimati Paulomi Mukherjee and child-artists Ashoka Basu, Arabraj Banerjee and Shraddha Dasgupta. Worship of Sri Sri Siddhidata-Ganesha took place on the morning of 1st February. Puja was followed by yagna and prasad distribution. A beautiful programme of bhajans by our Guru-brothers and sisters took place in the evening. Worship of Sri Sri Maha-Ganesha was conducted on the morning of 2nd February. This was followed by yagna, distribution of prasad and a programme of devotional songs in the evening.

19th February: Sree Sree Maa alongwith some Ashramites visited 'Hotor Ashram' on their annual programme. Shadhvi Suchetanandamoyee and Shadhvi Punyanandamoyee welcomed Sree Sree Maa through arati and garlanding. The students and brahmacharinis of the ashram also paid their homage to Sree Sree Maa. The children of the Ashram performed a beautiful cultural programme. After having prasad, they all returned back. On this evening Sri Subrata Sengupta presented Rabindra Sangeet in presence of Sree Sree Maa at Akhanda Mahapeeth.

24th February: On the auspicious occasion of 'Shivaratri' Sree Sree Maa performed puja of Lord Shiva at night in personal solitude. Thereafter, Guru-brother Sri Jagna Narayanda performed the yagna.

12th March: Prasad was offered to Sri Sri Radhamadhava in the Ashram premises and 'dol-purnima' was celebrated through a cultural evening where a beautiful dance recital was performed by the troupe of Pandit Sri Giridhari Nayak on Vasant Utsav.

26th March: The 22nd 'Adhyatmik Sabha' was organised. Our brother disciple Dr.Barun Dutta presented the discourse on 'Kathopanishad'.

4th April: On the auspicious occasion of Asthami tithi of the Navaratri festival, puja of Mata Annapurna was held in the Annapurna temple. Prasad was distributed among the children and devotees.

5th April: A mesmerising program of bhajans was held in the Ashram marking the holy occasion of Ram Navami.

14th April: A large gathering of devotees and disciples was held at guru-brother Sri Rajendra Sethia's residence due to visit of Sree Sree Maa at the place. The evening was spent heartily amongst songs and satsang. The visitors enjoyed the prasad at the end.

Forthcoming Events

Buddha Purnima: 10th May, Wednesday
Spiritual Congregation: 25th June, Sunday
Guru Purnima: 9th July, Sunday

Statement about ownership and other particulars about HIRANYAGARBHA to be published in the first issue every year after the last day of february.

1. Place of publication : Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

2. Periodicity of Publication : Quarterly

3. Printer's Name : Dr. Barun Dutta
Nationality : Indian
Address : Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

4. Publisher's Name : Dr. Barun Dutta
Nationality : Indian
Address : Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

5. Editor's Name : Sri Arnab Sarkar
Nationality : Indian
Address : Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital.
: Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

I, Dr. Barun Dutta, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledege and belief.

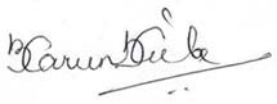

Date: 15th April, 2017 Signature of the Publisher

Subscription for Hiranyagarbha

Hiranyagarbha is a quarterly journal. The subscription fee for the journal in case of hand collection is **Rs. 80.00** and for postal delivery is **Rs. 100.00** per year (within India). Subscription forms may be obtained at the Ashram premises or by emailing to akhanda.mahapeeth@gmail.com. For information and help, contact Sri Arnab Sarkar (Mob. 094748-96776), Smt. Keya Chakraborty (Mob. 094324-56831), Sri Mohit Shukla (Mob. 094321-70365); Website : www.akhanda-mahapeeth.org.

হিরণ্যগর্ভের গ্রাহক হবার জন্য অথবা গ্রাহকত্ব পুণর্নবিকরণের জন্য
নিম্নের ফর্মটি পূরণ করে আশ্রমের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

Form No. .....

Akhanda Mahapeeth
Mata Sharbani Trust

Hiranyagarbha Subscription Form/Renewal Form

1. Subscription in Favour of (Name) : .....
2. Address : .....

.....

.....

3. Phone No. 1..... 2..... Email : .....
4. Period of Subscription : ☐ 1 year / ☐ 2 years / ☐ 3 years.

   From (Date) : ..... To (Date) : .....
5. Delivery Mode : ☐ Hand Collection / ☐ Postal Delivery.
6. Payment Mode : ☐ Cheque / ☐ Cash. Amount in Rs. .....

.....

Details of Cheque (drawn in favour of "Mata Sharbani Trust").....

.....

7. Checked by (Name) : .....

Signature :.....Date :.....